দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের রথযাত্রা
— পৃঃ ২৫

ছাত্রনেতাদের তোলাবাজি বন্ধ করতে আদৌ আন্তরিক কি শিক্ষামন্ত্রী
— পৃঃ ১১

৭০ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা।। ৯ জুলাই ২০১৮।। ২৪ আষাঢ় - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা, ২৪ আষাঢ়, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

৯ জুলাই - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

ভারতের মুসলমানের কাছে 'বন্দেমাতরম্' ইসলামবিরোধী, বাংলাদেশের মুসলমানের কাছে 'আমার সোনার বাংলা' মাতৃবন্দনা কীভাবে হয়? ▯ গূঢ়পুরুষ **▯ ৬**

খোলা চিঠি : বিজেপির মুসলিম তোষণ বন্ধ হোক ▯ সুন্দর মৌলিক **▯ ৭**

জনসম্পর্ক তৈরির রণনীতি আসলে প্রচারমাধ্যম ও বুদ্ধিজীবীদের যোগসাজসের বিরুদ্ধে লড়াই ▯ স্বপন দাশগুপ্ত **▯ ৮**

ছাত্রনেতাদের তোলাবাজি বন্ধ করতে আদৌ আন্তরিক কি শিক্ষামন্ত্রী ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত **▯ ১১**

মোদী সরকারের বিদেশনীতি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ▯ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত **▯ ১৩**

জনগণকে ভাবতে হবে কার হাতে দেশের ক্ষমতা দেবেন ▯ বরুণ মণ্ডল **▯ ১৫**

দ্রিঘাংচুর ভূয়োদর্শন : আমারি বঁধুয়া আনবাড়ি যায় ▯ ১৭

মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের রূপ ▯ উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল **▯ ২৩**

মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের রথযাত্রা ▯ জলজ বন্দ্যোপাধ্যায় **▯ ২৫**

তুলসীমঞ্চ ছাড়া বাঙালির গৃহস্থালী অসম্পূর্ণ ▯ চূড়ামণি হাটি **▯ ৩১**

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত ▯ সলিল গেঁউলি **▯ ৩৩**

গল্প : সারা অ্যাঞ্জেলিয়া ▯ সুবীর কুমার প্রামাণিক **▯ ৩৫**

বিচারপতি চেলামেশ্বরের নিঃশব্দে প্রস্থান ▯ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় **▯ ৪৩**

বিপুল অনাদায়ী ঋণ : ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় বিরাট সমস্যা ▯ তারক সাহা **▯ ৪৪**

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ অঙ্গনা : ২১ ▯ সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯ ▯ চিত্রকথা : ৪০ ▯ রঙ্গম : ৪১▯ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৪২ ▯ সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০

প্রকাশিত হবে
১৬ জুলাই, '১৮

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ছদ্মবেশী মাওবাদী

প্রকাশিত হবে
১৬ জুলাই, '১৮

মাওবাদী বললেই মুখে কালো কাপড় ঢাকা বন্দুকধারী নৃশংস ঘাতকদের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অথচ কত যে ছদ্মবেশী মাওবাদী আমজনতার ভিড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার হদিশ কেউ রাখেন না। তারা কেউ শিক্ষক, কেউ ছাত্র, কেউ আবার শিল্পী লেখক, কবি কিংবা নাট্যকর্মী। মাওবাদ প্রচার করার জন্য এরা লেখালেখি করেন, ছবি আঁকেন। নানাভাবে অর্থ সংগ্রহ করে এরা পুষ্ট করেন মাওবাদী কর্মকাণ্ডকে। এসব করার জন্য তাঁরা নিজেরাও টাকা পান। সেই টাকা আসে বিদেশ থেকে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা দেশহিতের মুখোশপরা এই ছদ্মবেশী মাওবাদীদের নিয়ে। লিখবেন, বিবেক অগ্নিহোত্রী, ড. অভিজিৎ চক্রবর্তী প্রমুখ

।। দাম একই থাকছে— দশ টাকা মাত্র।।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কুশিক্ষা হইতে অশিক্ষায়

সিপিএম একদা স্লোগান তুলিয়াছিল—'শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব।' কিন্তু রাজ্য-শাসন করিতে গিয়া তাহারা বুঝিয়াছিলেন সুশিক্ষা নবচেতনার জন্ম দিলে যে বিপ্লব উপস্থিত হইবে তাহাতে তাহাদের রাজ্যপাট টিকিবে না। সুতরাং সুশিক্ষার পরিবর্তে কুশিক্ষা দেওয়া হইলে ছাত্রগণের হতচেতন হইতে বিশেষ সময় লাগিবে না, উপরন্তু 'বিপ্লবে'র খোয়াব সৃষ্টি করিয়া রাজ্যপাট অক্ষুণ্ণ রাখিতে বেগ পাইতেও হইবে না। ইহা শিক্ষাক্ষেত্রে বামফ্রন্টের 'অনিলায়ন' প্রক্রিয়া নামে বহুল কথিত পদ্ধতির অন্যতম ছিল। হাল আমলে 'অনিলায়ন'-এর পরিবর্তে 'মমতায়ন'-এর যে প্রয়াস দেখা যাইতেছে তাহা পূর্বের অপেক্ষাও ভয়ংকর।

বামপন্থীদের দায় ছিল কুশিক্ষা দিয়া জাতির মেরুদণ্ড ভঙ্গ করিয়া দিবার, যাহাতে তাহাদের দেশবিরোধী আদর্শের প্রচার ও প্রসার ঘটে। তৃণমূলিদের অতশত দায় নাই। তাহারা ক্ষমতার চেয়ারটি বোঝে আর তাহা দখলে রাখিতে শিক্ষাদীক্ষার পাট চোকাইতে হইলেও তাহাদের আপত্তি নাই। ফলত বামপন্থীদের কুশিক্ষার পরিবর্তে তৃণমূলিরা 'অশিক্ষা'র আমদানি করিয়াছেন। এই শিক্ষার বশবর্তী হইয়াই হয়তো আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী রাজধর্ম অপেক্ষা দলধর্মকেই অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছেন। তিনি একদিকে দলের অধিবেশনে ঘোষণা করিয়াছেন যে, যুব নেতৃত্ব চাঁদা (পড়িতে হইবে 'তোলা') তুলিলে দলকে পঁচাত্তর শতাংশ দিতে হইবে। 'কৌটো নাড়িয়া' আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সুবৃহৎ অট্টালিকা বঙ্গবাসী দেখিয়াছেন। তপসিয়ায় বাইপাস সংলগ্ন গৃহটিকে নিতান্ত 'কুটীর' মনে হইবারই কথা, অন্তত জেলায় জেলায় ভুঁইফোঁড় তৃণমূলি নেতৃত্বের প্রাসাদোপম বাসভবনগুলিকে দেখিবার পর। এমতাবস্থায় দলনেত্রীর হুঁশিয়ারি যে যথেষ্ট সময়োচিত তাহাতে সন্দেহ কী?

অন্যদিকে সিন্ডিকেট হইতে ভর্তির দালালি রুখিতে তিনি যে সতর্কবাণী শুনাইতেছেন, তাহাতে তাঁহার পেটোয়া কিছু সংবাদমাধ্যম ও তাঁবেদার নেতৃত্বের তাঁহাকে 'রাজধর্ম পালনকারী' হিসাবে প্রতিপন্ন করিতে বিলক্ষণ সুবিধা হইতেছে বটে, কিন্তু ভুক্তভোগী রাজ্যবাসী মাত্রেই জানেন মুখ্যমন্ত্রীর সতর্ক বাক্যে কর্ণপাত করিবার পাত্র তাঁহার অনুগতরা নহে। কারণ মুখ্যমন্ত্রীর অনুগতরাও জানেন এই সতর্ক-বাণী তাঁহার স্নেহপ্রশ্রয় ব্যতীত আর কিছু নহে। রাজ্যে এহেন অপশাসনের যুগে বাণিজ্য আসিতেছে না বলিয়া যাঁহারা গলা ফাটান, তোলা বাণিজ্যের কথাটি তাঁহারা মাথায় রাখেন না। মুড়ি ও মিছরিকে একদর করিবার যে প্রবণতা হাল আমলে দেখা গিয়াছে, তাহাতে গৃহ-নির্মাণের সিন্ডিকেট হইতে মৎস্য কিংবা সবজি বিক্রেতা, অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়েও তোলা-ব্যবসার রমরমা বাঙালির বাণিজ্য-বিমুখতার দুর্নাম ঘুচাইয়া দিবে, ইহা নিশ্চিত রূপে বলা যায়।

সুতরাং কলেজে কলেজে ভর্তির সিন্ডিকেট দর দেখিয়া যাঁহারা বিস্ময় বোধ করিতেছেন, তাঁহারা বাস্তব সম্বন্ধে সচেতন নহেন। বাম আমলে প্রশাসন যেমন সর্বত্র পার্টি-কেন্দ্রিক হইয়াছিল তেমনি হাল আমলে পার্টিই প্রশাসনে রূপান্তরিত হইয়াছে। তাই কলেজে ভর্তি হইতে গেলে কলেজ কর্তৃপক্ষের উপর ভরসা করিলে বা রাজ্য প্রশাসনের উপর নির্ভর করিলে আর চলিবে না, পার্টির ছাত্র-নেতৃত্ব খুশি না হইলে কলেজের দ্বার খুলিবে না। ঋণের বোঝায় বেতনভুক সরকারি কর্মচারীরা মহার্ঘ্য ভাতা হইতে বঞ্চিত হইতে পারেন, ক্লাব-খয়রাতিতে মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু দরাজ-হস্ত। দলের দাদা-দিদিরা অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর ভরসায় না থাকিয়া নিজের রোজগারের পথ নিজেই খুলিতেছেন, ইহা ছাত্রদের পক্ষ হইতে 'সেলফ ফাইনান্সিং কোর্স' আর দাদা দিদিদের পক্ষে 'স্বনির্ভর যোজনা'র সরকারি তকমা পাইতে পারে কি?

এখন প্রশ্ন, এই অমানিশা হইতে মুক্তির উপায় কী। মনে রাখিতে হইবে, জলে থাকিয়া কুমিরের সহিত বিবাদ কেহই করিতে চায় না। প্রশাসনের মাথা না পাল্টাইলে, তৃণমূল-ভবন হইতে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর দলের মহাসচিবের রাজনৈতিক অমৃত ভাষণ বন্ধ না হইলে, সর্বোপরি নবান্ন দলীয় কার্যালয় মুক্ত না হইলে আশার আলোক দেখিবার আশা নাই।

সুভাষিতম্

পরোপকারায় ফলন্তি বৃক্ষাঃ পরোপকারায় বহন্তি নদ্যঃ।

পরোপকারায় দুহন্তি গাবঃ পরোপকারার্থমিদং শরীরম্।।

পরের উপকারের জন্য বৃক্ষ ফল দান করে, পরের উপকারের জন্য নদী প্রবাহিত হয়। পরের উপকারের জন্য গাভী দুধ দেয়, পরের উপকারের জন্যই আমাদের এই শরীর।

ভারতের মুসলমানের কাছে ‘বন্দে মাতরম্’ ইসলাম বিরোধী, বাংলাদেশের মুসলমানের কাছে ‘আমার সোনার বাংলা’ মাতৃবন্দনা কীভাবে হয়?

ভারত ভাগের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম্ গানটিকে কাটছাঁট করার কংগ্রেসি সিদ্ধান্তকে দায়ী করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, কংগ্রেস তোষণের রাজনীতি করতে গিয়ে বন্দে মাতরম্ গানটির বিভিন্ন স্তবক বাদ দিয়েছে। দেশভাগের ক্ষেত্র তখনই প্রস্তুত হয়েছিল। তাঁর মত, ‘অনেকে ব্রিটিশ সরকারের নীতি, মুসলিম লিগের দ্বিচারিতা, খিলাফত আন্দোলনকে দায়ী করেন দেশ ভাগের জন্য। আমি বলি, কংগ্রেসের বন্দে মাতরম্ গানের একাধিক স্তবক কেটে ফেলে দেওয়ার সিদ্ধান্তই দেশভাগের আসল কারণ। ভগৎ সিংহ, ক্ষুদিরাম বসুরা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন এই গানে অনুপ্রাণিত হয়েই। রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি বলতে আমরা আসলে যা বুঝি, বন্দে মাতরম্ আসলে ঠিক তাই। কংগ্রেসের মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গানটি গেয়েছিলেন। আজ সেই কংগ্রেসই বন্দে মাতরম্ পুরোটা গায় না। মুসলমান তোষণ করতে গিয়ে কংগ্রেস বন্দে মাতরম্‌কে দ্বিখণ্ডিত করেছে।’ হ্যাঁ, এটাই একমাত্র ঐতিহাসিক সত্য। তবে অপ্রিয় সত্য বলে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা মানতে চান না। আর একথাও ঐতিহাসিক সত্য যে দেশের কংগ্রেসিরা চিরকালই বামেদের কাছ থেকে বুদ্ধি ও মনন ধার করে রাজনীতি করেছেন। শুধু নেহরু-গান্ধী পরিবারকে দোষ দিয়ে লাভ কী?

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপিকা সৈয়দ তানভীর নাসরীন সম্প্রতি এক প্রবন্ধে লিখেছেন, ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কোন যুক্তিতে বলব তিনি মুসলমান বিরোধী ছিলেন? বন্দে মাতরমের স্রষ্টাকে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক আখ্যায় কলঙ্কিত করে রাখব?’ বঙ্কিমচন্দ্রের ১৮০ তম জন্মবার্ষিকীতে এটাই জরুরি প্রশ্ন। বঙ্কিমচন্দ্র, আনন্দমঠ এবং বন্দে মাতরম্ ভারতীয় জাতীয়তাবোধের সমার্থক। অথচ এই তিনটি শব্দ নিয়ে আলোচনা হলেই তথাকথিত প্রগতিশীল সেকুলার বুদ্ধিজীবীরা হৈহৈ করে আসরে নেমে পড়ে গলাবাজি করেন। তাঁদের বক্তব্য, বন্দে মাতরম্ গানে

গুরুপুরুষের কলম

যেহেতু দেশকে ‘মা’ হিসাবে বন্দনা করা হয়েছে তাই এই গান ভারতীয় মুসলমানেরা জাতীয় সংগীত বলে মেনে নেবেন না। কারণ, দেশকে ‘মা’ হিসাবে বন্দনা করাটা নাকি ইসলাম বিরোধী। এখানেই প্রশ্ন চিহ্ন তুলেছেন তানভীর নাসরীন। তিনি জানতে চেয়েছেন, ‘‘ভারতের মুসলমানের জন্য যদি দেশমাতৃকার বন্দনা ধর্ম বিরোধী হয় এবং বন্দে মাতরম্ গান ইসলাম বিরোধী হয়, তবে বাংলাদেশের ১৪ কোটি মুসলমান কোন যুক্তিতে ‘আমার সোনার বাংলা’ আবেগবিহ্বল চিত্তে গাইতে পারে? বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসাবে গ্রহণ করতে পারে? রবীন্দ্রনাথের এই গানেও দেশকে মা রূপেই কল্পনা করা হয়েছে। বলেছেন, ‘মা তোর বদনখানি মলিন হলে...নয়নজলে ভাসি’। রবীন্দ্রনাথ ধর্মনিরপেক্ষ। আর বঙ্কিমচন্দ্র সাম্প্রদায়িক?’’

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনীকার অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য লিখেছেন, আনন্দমঠের সন্ন্যাসীরা মুসলমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হলে আমরা বলি বঙ্কিম মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন। অথচ, বঙ্কিম যখন উপন্যাসের শেষে মহাপুরুষের মুখ দিয়ে হিন্দু সন্তানদলের হাত থেকে রাজ্যশাসনের অধিকার কেড়ে নেওয়ার কথা বলেন তখন আমরা তাঁকে হিন্দুবিদ্বেষী বলি না কেন? এর উত্তর, কংগ্রেসের ভ্রান্ত তোষণ নীতি। বামপন্থীদের মতলবি রাজনীতি। নজরুলকে বিচার করতে গেলে যেমন তাঁকে মুসলমানের কবি বলাটা ভুল এবং অনুচিত, তেমনই বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম্ গানটিকে হিন্দু সাম্প্রদায়িক বলে দেগে দেওয়ার চেষ্টাটাও অন্যায়। কংগ্রেস নেতারা এই অন্যায় কাজটি করে ভারতকে সাম্প্রদায়িকতার দাঁড়িপাল্লায় ভাগ করেছেন। অমিত শাহ ঐতিহাসিক সত্যটি বলেছেন বলে অযথা বিতর্ক শুরু করা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের কন্যা সরলাদেবী চৌধুরাণীর আত্মজীবনী ‘জীবনের ঝরাপাতা’ রচনায় বলেছেন, ‘‘বঙ্কিমের স্মৃতি প্রসঙ্গে বন্দে মাতরম্ গান ও মন্ত্রের স্মৃতি ভেসে না উঠে যায় না। রবীন্দ্রনাথই বন্দে মাতরম্ গানের প্রথম সুর বসিয়ে ছিলেন। তবে তাঁর দেওয়া সুরে দুটি পদে গানটি চলিত ছিল। একদিন রবি মামা আমায় ডেকে বললেন, তুই বাকিটুকুতে সুর দিয়ে ফেল না। তাঁর আদেশে ‘সপ্তকোটিকণ্ঠ কলকলনিনাদ করালে’ থেকে শেষ পর্যন্ত গোড়ায় সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুর দিয়ে ফুটিয়ে নিলুম। সেই থেকে সভাসমিতিতে সমস্তটাই গাওয়া হতে থাকল। কিন্তু কংগ্রেস হাইকম্যান্ড থেকে কাটাছাঁটা বন্দে মাতরম্ গাওয়ায় হুকুম বেরিয়েছে...।’’ কংগ্রেস নেতৃত্ব বাঙালিদের কোনোদিন পছন্দের ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরককে ছেঁটে ফেলতে পারেনি। কারণ, সাহেবরা তাঁকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করেছিল। নেহরুজী আবার অতিরিক্ত সাহেব ভক্ত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে মুসলমান বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক যাঁরা বলেন তাঁদের ক্ষমা নেই। ■

বিজেপির মুসলিম তোষণ বন্ধ হোক

মাননীয়া পাঠক-পাঠিকা,

মেসি, রোনাল্ডো নেই বিশ্বকাপে। মন খারাপ করবেন না। ভারতেও তো বিশ্বকাপের উত্তাপ আসছে। আসছে কেন, এসেই গেছে। অমিত শাহ রাজ্যে এসে ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়ে গেছেন। পুরুলিয়ায় দাঁড়িয়ে যে হুঙ্কার দিয়েছেন তা কলকাতায় পৌঁছেছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

ধর্মনিরপেক্ষ তৃণমূল কংগ্রেস ঠিক করেছে এবার রাজ্যে বিজেপিকে রুখতে মূল অস্ত্রটাই হবে মুসলমান ভোট এক করা। ওই ভোটে যেন কংগ্রেস, বিজেপি ভাগ বসাতে না পারে। তাহলেই জয় নিশ্চিত। সেটা সীমান্তবর্তী জেলা থেকে মেটিয়াবুরুজের 'মিনি পাকিস্তান' সর্বত্র।

বিজেপি হিন্দুদের দল এই তকমাটা ভালো করে লটকে দিতে পারলেই জয় নিশ্চিত। এটা হিসেব বলছে। কিন্তু বীরভূম থেকে পুরুলিয়ায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে মুসলমানপ্রধান এলাকাতেও বিজেপির যে ফল তাতে 'অ্যালজোলাম' ছাড়া ঘুম আসছে না।

বিজেপি মুসলমান বিরোধী। এই আওয়াজ তুলেই মমতার ফেডারেল ফ্রন্ট হবে। রাজ্যে রাজ্যে মুসলমান ভোট একত্রিত করে গোটা দেশকে দুটো ভাগে ভাগ করে ফেলতে হবে। সেই অঙ্কে ভোটে জেতা যাবে কিনা জানা নেই, তবে দেশজুড়ে ভাগটা বেশ স্পষ্ট হবে।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে অন্য জায়গায়। মোদী সরকারের কিছু কাজকর্ম যা তথ্য দিচ্ছে তাতেই মুশকিল।

১৪ জুলাই থেকে শুরু হবে হজ যাত্রা। দফায় দফায় চলবে গোটা জুলাই মাস ধরে। এবার ভারতের হজ যাত্রীর মোট সংখ্যা ১ লাখ ৭৫ হাজার ২৫ জন। এটা সর্বকালীন রেকর্ড। না, এখানেই রেকর্ড শেষ নয়। আরও বড় রেকর্ড হলো— মোট যাত্রীর ৪৭ শতাংশ মহিলা। সত্যি এটাকে মুসলিম তোষণ ছাড়া কী বলা যায় বলুন তো! কিন্তু বিরোধীরা সেটা বলতে পারছে না। বললে যে ইস্যুটাই হারিয়ে যাবে।

গত জানুয়ারি মাসে মোদী সরকার ঘোষণা করে এতদিন চলে আসলেও হজ যাত্রীদের আর কোনও ভরতুকি দেবে না কেন্দ্র। সেই টাকা সংখ্যালঘু উন্নয়নের অন্যান্য খাতে খরচ করা হবে।

একই সঙ্গে এই প্রথমবার ভারতীয় মুসলমান নারীরা পুরুষ সঙ্গী ছাড়াই হজ যাত্রায় অংশ নিতে পারছেন। সংখ্যালঘু মন্ত্রক সূত্রে খবর, এই বছরে মোট ১ হাজার ৩০৮ জন মহিলা পুরুষ সঙ্গী বা 'মেহরাম' ছাড়াই হজ যাত্রায় শামিল হচ্ছেন।

নরেন্দ্র মোদী মন্ত্রীসভার সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী মুখতার আব্বাস নকভি জানিয়েছেন, এই বছরে মোট ৩ লাখ ৫৫ হাজার ৬০৪টি আবেদন জমা পড়ে। এর মধ্যে পুরুষ আবেদনকারী ছিলেন ১ লাখ ৮৯ হাজার ২১৭ জন। আর মহিলা ১ লাখ ৬৬ হাজার ৩৮৭ জন। হজ কমিটির থেকে হজ যাত্রার অনুমোদন পেয়েছেন ১ লাখ, ৭৫ হাজার ২৫ জন। স্বাধীনতার পরে এই প্রথম এত বেশি সংখ্যায় মানুষ হজ করতে যাচ্ছেন।

এই প্রথমবার হজ যাত্রীদের ভরতুকি দিচ্ছে না সরকার। অন্য দিকে, সৌদি আরব নানারকম কর চাপিয়েছে। তা সত্ত্বেও এত বেশি তীর্থযাত্রী! একই সঙ্গে তাঁর দাবি, এই বছরে যাত্রী সংখ্যা বেশি হলেও বিমান ভাড়া বাবদ খরচ কম হচ্ছে। আগের বছরে ১ লাখ ২৪ হাজার ৮৫২ জনের জন্য বিভিন্ন এয়ারলাইনসকে দিতে হয়েছিল ১ হাজার ৩০ কোটি টাকা। কিন্তু এবার যাত্রী সংখ্যা বাড়লেও বিমান ভাড়া কমায় ওই খাতে খরচ হয়েছে ৯৭৩ কোটি টাকা। ৫৭ কোটি টাকা কম। এটা কি মুসলমান তোষণ নয়!

গত ২২ আগস্ট এক ঐতিহাসিক রায়ে ভারতীয় মুসলমান সমাজে দীর্ঘকাল প্রচলিত তিন তালাককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সুপ্রিম কোর্ট। সেই সময়েই এ নিয়ে দেশে আইন তৈরির নির্দেশও দেয় সর্বোচ্চ আদালত। আশ্চর্য লাগলেও সত্য যে, এই দাবি নিয়ে স্বাধীনতার পরে কেউ সাহস দেখাতে পারেনি। কারণ, ভোট-ভয়। আইনও হচ্ছে কড়া। এটা অবশ্য মুসলমান তোষণ নয়। বরং, বলতে পারেন— মুসলিম মহিলা তোষণ।

কিন্তু এভাবে চললে কী করে হবে! আরে বাবা জ্যোতি বসুকে দিয়ে হয়নি। অন্তত মমতা দিদিকে দিয়ে তো বাঙালি প্রধানমন্ত্রীর সাধ পূর্ণ করতে হবে নাকি!

আহা সেই দিন কবে আসবে। কেন্দে পোথমবার তিনমূল গরমেন্ট। (বানান-দিদি অভিধান মেনে)

—**সুন্দর মৌলিক**

জনসম্পর্ক তৈরির রণনীতি আসলে প্রচারমাধ্যম ও বুদ্ধিজীবীদের যোগসাজশের বিরুদ্ধে লড়াই

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

আজকাল তথাকথিত সোশ্যাল মিডিয়া গালিগালাজ, মিথ্যে দোষারোপ, ধুমধাড়াক্কা যা মনে আসে তাই বলে কুৎসা রটানোর শক্তিশালী সংবাহক হওয়ার পাশাপাশি এর মাধ্যমে খুন ও ধর্ষণের হুমকি আসাও বাকি নেই। তবু একে ধিক্কার দেওয়ার আগে এটাও বলা দরকার যে, এই একটি জায়গা কিন্তু রয়েছে যেখানে তুলনামূলকভাবে বিবেচক মুদ্রিত সংবাদমাধ্যম বা 'যা পাই তাই খাই' ঘরানার বৈদ্যুতিন মাধ্যমের কোনোটাইতেই জায়গা না পাওয়া সংবাদগুলি প্রকাশ্যে আনা যায়।

বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে এই সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রায়শই দেখা যাচ্ছে বিজেপি নেতারা প্রায় নিঃশব্দে প্রচারের ঢক্কানিনাদের বাইরে থেকে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করা মানুষজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন। এগুলি সবই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে করা হচ্ছে। 'সম্পর্ক থেকে সমর্থন' শীর্ষক এই সাক্ষাৎকারগুলির ক্ষেত্রে বিজেপির সভাপতি অমিত শাহ থেকে মন্ত্রীমণ্ডলীর অনেক সদস্য ও দলের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীরাও অংশ নিচ্ছেন। এঁরা বিশিষ্ট জনদের মূলত নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার বিগত বছরগুলিতে কী কাজ করেছে, দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক কিছু করেছে কিনা তাই জানাচ্ছেন।

২০১৯-এর সংসদীয় নির্বাচনের দিকে নজর রেখে এই ধরনের মার্জিত পদ্ধতিতে প্রচার করার প্রচেষ্টা সর্বদাই প্রশংসনীয়। বেশ কয়েক দশক ধরে এক একটি কেন্দ্রের জনসংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে ভোটদাতাদের কাছ থেকে প্রায়শই অভিযোগ শোনা যায় যে, রাজনীতি ও রাজনীতিবিদরা আজকাল মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। তাঁরা জানেনই না যে, মানুষের কী ধরনের অসুবিধে বা সমস্যা হতে পারে। ভারতের নির্বাচকমণ্ডলীর গরিষ্ঠাংশ কখনই তাদের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে চোখেও দেখে না, আর জনপ্রতিনিধিদের সম্বন্ধে তাদের কোনও নির্দিষ্ট ধারণাও নেই। যা আছে তা আজগুবি ধারণা। তাদের যেটুকু হালকা ধারণা তৈরি হয় তা মিডিয়ার আঁচে সেদ্ধ, তাই খুব কম সময়ই তা নৈর্ব্যক্তিক হয়। অন্যদিকে কেবলমাত্র গালগল্প বা গুজবের মাধ্যমে একটা ভাবমূর্তি তৈরি করে লোকের মনে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় যেটা অবধারিতভাবেই অসত্য ও দুরভিসন্ধিমূলক। মানুষের মধ্যে গণতন্ত্রের স্নিগ্ধ ছোঁয়ার অনুভব সঞ্চারিত করতে ও রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে সব সময় মানুষকে সমষ্টিগত ভাবে দেখার প্রবণতা ছেড়ে তাদের ব্যক্তি সত্তা হিসেবে দেখার এ প্রচেষ্টা শুভ।

বিশেষ করে বিজেপির ক্ষেত্রে এর একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। বিজেপি দলের মধ্যে শুধু নয় সমগ্র গৈরিক ভ্রাতৃত্ববোধ সংবলিত সংগঠনের মধ্যে একটা দৃঢ় ধারণা রয়েছে যে, তাদের সঠিক ভাবমূর্তিটি সমাজের কাছে বরাবর বিকৃত করে উপস্থাপিত করা হয়। এই বিকৃতি কর্মকে নেতৃত্ব দেয় একটি সংগঠিত বুদ্ধিজীবীশ্রেণী যারাই পক্ষান্তরে তৈরি করে দেয় মিডিয়ার দৃষ্টিকোণ বা বক্তব্য যাই বলা যাক না কেন। এই বুদ্ধিজীবী ও প্রচারমাধ্যমের পারস্পরিক যোগসাজশই বিদেশেও ভারতের ভাবমূর্তি নির্মাণে কলকাঠি নাড়ে, কেননা ভারত থেকে খবরাখবর সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিদেশি প্রচারমাধ্যমগুলি কেবলমাত্র ইংরেজি ভাষায় প্রচারিত সংবাদমাধ্যমগুলিরই প্রতিবিম্ব হিসেবে কাজ করে। স্থানীয় মাধ্যম এখানে যা ছাপে বা বলে সেটিকেই তারা ধ্রুব সত্য হিসেবে বিদেশে পরিবেশন করে। কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদী, মানবাধিকার কর্মী, কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মী ও মুষ্টিমেয় ইংরেজিতে কথা বলতে দক্ষ রাজনীতিবিদ ছাড়া বিদেশি সাংবাদিকের প্রধান যোগাযোগ ইংরেজি বলা ভারতীয় সাংবাদিকের সঙ্গে। এই নিতান্ত একই প্রজাতির জীবদের মধ্যে (যেমন একই বংশের অভ্যন্তরে বিষম বা অধম বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়) তেমনি আদান প্রদান চলে, সেখানে গেরুয়া ভাবনা-চিন্তার মানুষের কোনও জৈবিক অস্তিত্বই নেই।

একটা অতি দীর্ঘ সময় ধরে বিশেষ করে বিগত চার বছরের অধিকাংশ সময় মোদী সরকার এই নিরন্তর বেড়ে চলা নেতিবাচক প্রচারকে কোনও গুরুত্বই দেয়নি। এর একটা বড় কারণ হচ্ছে এই প্রতিস্পর্ধী প্রচারমাধ্যম ও সংগঠিত তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহল ও সমাজে দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ করতে সক্ষম এমন সব ব্যক্তিদের সংগঠিত আক্রমণের মোকাবিলা করেই ২০১৪ সালে মোদী সরকার বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু আজকে চার বছর কেটে যাওয়ার পর মোদী বিরোধীরা তাদের আয়ত্তাধীন যা কিছু আয়ুধ সবই একযোগে তাঁর দিকে তাক করছেন। এই পরিস্থিতিতে

সরকার ও দল কখনই এসবের থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখতে পারে না। কোনও কিছুতেই সুযোগ নিতে পারে না। জনতার রায় পুনর্বার নিজের দিকে নিশ্চিত করতে দলকে যে জিনিসটা করতে হবে তা হলো ভোটদাতাদের সর্বাধিক সংখ্যায় নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও ভোটগ্রহণ কেন্দ্র পৌঁছে ভোট দেওয়ানো। অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রিত একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির বুদ্ধিজীবী যারা এক ইশারাতে যে-কোনও সময় চাহিদামতো নিবন্ধ রচনা, টিভিতে বাণী দেওয়া থেকে রাতবিরেতে যখন হোক বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকেন তাঁদের বিরুদ্ধে লড়া অবশ্যই চাট্টিখানি কথা নয়। অবশ্য, সারা বিশ্বে যেখানেই দক্ষিণপন্থী ও রক্ষণশীল দলগুলির উত্থান হয়েছে, সেখানেই এঁরা তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের আক্রমণের মুখে পড়েছেন। কখনও আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'বুদ্ধুদের দল' কখনও বা জুটেছে 'নোংরা দলের' তকমা। এর ওপর বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় প্রবাদকে সজীব রাখতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান ও কলা বিভাগের লোকজন তাঁদের মনমতো নয় এমন কিছু দেখলেই তার বিরুদ্ধে 'রক্ষণশীল, রক্ষণশীল' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন।

ভারতীয় হিন্দুর ধর্মভাব সর্বদাই এঁদের নির্ধারিত অনুশাসনের বিরোধী। পূর্বতন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার কার্যকর্তা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা প্রভেদ করতেন। মার্কিনদেশে যারা বিশেষ শোরগোল করে না এমন নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠদেরই রিপাবলিকানরা চরমপন্থী ও প্রতিস্পর্ধী সংস্কৃতির ধ্বজাধারীদের বিরুদ্ধে এককাট্টা করেছিলেন। ঠিক একই ভাবে আমাদের এখানে যে সমস্ত মানুষ নিজের পাড়ায় সম্মাননীয়, ব্যক্তি জীবনে ও পেশাগত জীবনে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছেন তাদেরকে দিয়ে এই সমস্ত তথাকথিত বাজার গরম করা বুদ্ধিজীবীদের মেকাবিলা কি করা যায় না? এই ছায়ায় থাকা লোকগুলি হয়তো বইপত্তর লেখেননি বা কোনও সাহিত্য উৎসবে সন্দর্ভ পাঠ করেননি, খুব জোর হয়তো নিজের পাড়ার কোনও ক্লাবের অনুষ্ঠানে বা কাজকর্মে অংশ নিয়েছেন। এই মানুষগুলির মূল্যবোধের মানদণ্ড কিন্তু একটু অন্য ভাবে পরিচালিত হয়। এঁরা সময়ে দেয় কর দিয়ে দেন, দুর্নীতি থেকে দূরে থাকেন, কারুর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে সঙ্ঘবদ্ধ হন না, অথচ জনজীবনে একটা ন্যায়নীতির আবহ বজায় রাখতে ভালবাসেন। একই সঙ্গে এঁরা জাতির সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার বিষয়েও সদা সচেতন। এঁরাই কিন্তু সঠিক অনুধাবন করতে পারেন নির্ণায়ক নেতৃত্ব কী আর রাজনৈতিক স্থায়িত্বই বা কাকে বলে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর শৌচাগার নির্মাণকে একটি আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলায় ও গ্রামীণ এলাকায় রান্নার গ্যাস সরবরাহে বিপুল বৃদ্ধি ঘটানোর মাধ্যমে মহিলাদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য সমর্থক শ্রেণী তৈরি করেছেন। এখন তাঁকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী শুধু নয়, সেই অর্থে মধ্যবয়সীদের একটু সচল করে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে হবে। সহজে বললে ভারতের অগ্রগতিতে যাঁরা নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারেন তাদের কাছে টানতেই হবে।

আজকের তরুণ যারা তুমুল আশাবাদী ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে বদ্ধপরিকর, তাদের একটা বড় অংশের মধ্যে মোদীজীর একটা বড় সংখ্যক সমর্থক রয়েছে। বিভিন্ন নির্বাচন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ঘাঁটলে বুঝতে পারা যায় প্রধানমন্ত্রী তাঁর শৌচাগার নির্মাণকে একটি আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলায় ও গ্রামীণ এলাকায় রান্নার গ্যাস সরবরাহে বিপুল বৃদ্ধি ঘটানোর মাধ্যমে মহিলাদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য সমর্থক শ্রেণী তৈরি করেছেন। এখন তাঁকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী শুধু নয়, সেই অর্থে মধ্যবয়সীদের একটু সচল করে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে হবে। সহজে বললে ভারতের অগ্রগতিতে যাঁরা নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারেন তাদের কাছে টানতেই হবে। সেই কারণে আগামী সাধারণ নির্বাচন দুটি প্রতিযোগিতামূলক মূল্যবোধের যে কোনও একটিকে বেছে নেওয়ার সুযোগ দিচ্ছে। ■

রম্যরচনা

পরীক্ষায় প্রশ্ন ছিল—

তিলপাড়া ব্যারেজ সম্বন্ধে যা জান লেখ।

বাচ্চু উত্তর লিখছে :

তিলপাড়া ব্যারেজ পশ্চিমবাংলার সিউড়িতে ময়ূরাক্ষী নদীর উপর তৈরি হয়েছে। এই ব্যারেজ তৈরি করতে লরি লরি পাথর, সিমেন্ট আনতে হয়েছে। লরির ড্রাইভার ছিল সর্দাররা। বল্লভভাই প্যাটেলও সর্দার ছিলেন। তাকে লৌহপুরুষ বলা হয়। লৌহ টাটাতে তৈরি হয়। টা টা হাত দিয়ে দেখানো হয়। আইনের হাত খুব লম্বা হয়। জওহরলাল নেহরু আইন জানতেন। ছোটরা নেহরুকে চাচা বলতো। নেহরু গোলাপ জলের মিষ্টি সরবত খেতে ফালোবাসতেন। মিষ্টিতো চিনিতেও হয়। পিপীলিকায় চিনি খায়। বীরভূম জেলার আমোদপুরে চিনির মিল ছিল। মিল তো চালেরও হয়। কাপড়েরও হয়। কলকাতায় কাপড়ের মিল আছে। কলকাতায় চিড়িয়াখানাও আছে। চিড়িয়াখানায় শের (বাঘ) আছে। চল্লিশ সেরে এক মন। মন খুব চঞ্চল হয়। চঞ্চল আমার পিছনের বেঞ্চে বসে। ওরা বাবা বেলের মোরব্বা খেতে ভালোবাসে। সিউড়ির মোরব্বা বিখ্যাত। ওই সিউড়িতেই তিলপাড়া ব্যারেজ অবস্থিত।

উবাচ

অধীর চৌধুরী
প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি

“দিদি নিজে বিষবৃক্ষ পুঁতেছিলেন। আজ তা ফল দিচ্ছে। নিজের দলের ছাত্রনেতারা গ্রেপ্তার হওয়ার কারণেই দিদি এখন শাক দিয়ে মাছ ঢাকছেন।”

কলেজে কলেজে তৃণমূল ছাত্রনেতাদের তোলাবাজি প্রসঙ্গে

মনোজ সিনহা
কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী

“তৃণমূল সরকার নয়, বাংলায় মূলত অপরাধীদের রাজত্ব চলছে। বাংলার মানুষ তৃণমূলের এই অপশাসন আর মেনে নেবে না।”

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দিল্লিতে বঙ্গবিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তব্য

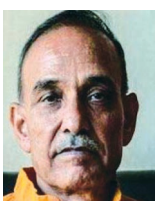

সত্যপাল সিংহ
কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী

“রসিকতা নয়। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। রসায়নে ডক্টরেট করেছি। বাঁদর যে মানুষের পূর্বপুরুষ নয় তা দশ থেকে কুড়ি বছরের মধ্যে প্রমাণ হয়ে যাবে। আর ডারউইনের বিবর্তনবাদ ভুল বলে প্রমাণ হবে।”

ডারউইনের বিবর্তনবাদ প্রসঙ্গে

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

“জি এস টি-তে করের হার একই হলে বিষয়টি অনেক সহজ হতো। কিন্তু তার ফলে খাদ্যসামগ্রীর ওপর শূন্য শতাংশ কর রাখা সম্ভব হতো না। মার্সিডিজ গাড়ি ও দুধের ওপর একই হারে কর ধার্য করা যায় না।”

একই হারে কর চালুর দাবি প্রসঙ্গে

ছাত্রনেতাদের তোলাবাজি বন্ধ করতে আদৌ আন্তরিক কি শিক্ষামন্ত্রী

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

পুরুলিয়ার জনসভায় বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের ভাষণের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বিজেপি সভাপতিকে তিনি বলেছেন 'শূন্য কলসি'। পার্থবাবু প্রতিদিন বিবিধ বিষয়েই প্রতিক্রিয়া দিয়ে থাকেন। আন্তর্জাতিক বিষয় থেকে পাড়ার ফুটবল— কোনও বিষয়েই বিবৃতি দিতে আপত্তি নেই পার্থবাবুর। নিজের দেওয়া এতসব বিবৃতির ভিড়ে নিজেই ভুলে যান অতীতে কী বলেছিলেন। একটি আঞ্চলিক দলের সরকারের একজন শিক্ষামন্ত্রী এহেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে একটি সর্বভারতীয় দলের জাতীয় সভাপতির বক্তব্যের পিঠে বিবৃতি দেওয়ার লোভ সংবরণ করা বড়ই মুশকিল! তাই তিনি দিয়েছেন। তাঁর বিবৃতি দেওয়ার অভ্যাস নিয়ে কিছু বলছি না। কিন্তু বিবৃতিতে তিনি যে কথাটি বলেছেন— 'শূন্য কলসি' তা নিয়েই প্রশ্ন জাগছে। শূন্য কলসি আমরা তাঁকেই বলি, যার ভিতরে কিছু নেই, অথচ নিছক শব্দ করে। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ 'শূন্য কলসি' কিনা তা ভবিষ্যতে রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতিই বলে দেবে। কিন্তু পার্থ চট্টোপাধ্যায়? তিনি কি পূর্ণ কুম্ভ? পার্থ চট্টোপাধ্যায় এই রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী। শিক্ষাক্ষেত্রে সবরকম বিশৃঙ্খলা, সবরকম কদর্যতা, সবরকম অন্যায় এবং দুর্নীতি বন্ধ করাই তাঁর কর্তব্য এবং দায়িত্ব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন ব্রাত্য বসু। তাঁকে আচমকাই শিক্ষা দপ্তর থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে সরিয়ে দিয়ে শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেন তৃণমূল নেত্রী। ব্রাত্যবাবু শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন কলেজগুলিতে অনলাইনে ভর্তির ব্যবস্থা চালু করতে চেয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল একটাই। তা হলো, টাকা নিয়ে কলেজে ভর্তি করার দুর্নীতি বন্ধ করা। ব্রাত্যবাবু এই পদক্ষেপ নিতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আচমকাই তাঁকে শিক্ষা দপ্তর থেকে বদলি করে দেন তৃণমূল নেত্রী। তৃণমূলের অন্দরের খবর, ব্রাত্যবাবুর কঠোর অবস্থান মোটেই পছন্দ হয়নি নেত্রীর। ব্রাত্যবাবুকে বিদায় দিয়ে সেই জায়গায় নিজের বশংবদ পার্থবাবুকে নিয়ে আসেন নেত্রী। পার্থবাবুরও দলনেত্রীর মতো একটি ডক্টরেট ডিগ্রি আছে। এবং নেত্রীর ডক্টরেট ডিগ্রির মতোই পার্থবাবুর ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়েও বাজারে যথেষ্ট সন্দেহ এবং বিতর্ক চালু আছে।

> "শুধু মৌখিক হুমকি দেওয়া ছাড়া মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী কোনও কঠোর পদক্ষেপ এখনও পর্যন্ত করেননি। ফলে তোলাবাজ ছাত্রনেতারাও বুঝে গেছে, লোক দেখাতে ওই হুমকিটুকুই শুধু দেওয়া। আসলে তাদের কামিয়ে নেওয়ার পথ খুলেই রেখেছে প্রশাসন এবং দল।"

পার্থবাবুর শিক্ষামন্ত্রিত্বের আমলে পঞ্চায়েতের মতো সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও বিরোধী শূন্য। দু-একটি হাতে গোণা কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে বাদ দিলে সবক'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। এই দোর্দণ্ডপ্রতাপ ছাত্র সংগঠনটির সামনে শিক্ষকসমাজও আজ অসহায়, নতজানু। ছাত্রনেতাদের হাতে লাঞ্ছিত হবার বদলে নিজ মান-সম্ভ্রম বাঁচানোকেই শ্রেয় বলে মনে করেন শিক্ষকরা। এই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ডাণ্ডা ঘোরানো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তির মরশুমে কী চলছে? প্রতিদিন সংবাদ মাধ্যমগুলিতে চোখ বোলালেই বোঝা যায়— কী অরাজক অবস্থা চলছে এই ভর্তির মরশুমে। যতই অনলাইনে ফর্ম তোলার ব্যবস্থা চালু হোক না কেন, ছাত্রনেতাদের দাবি মতো তোলার টাকা দেওয়া না হলে কোথায়ই ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি হতে দেওয়া হচ্ছে না। এই তোলার টাকা কোথাও দশ হাজার, তো কোথাও পঞ্চাশ হাজার। ভর্তির ফর্ম আটকে রেখে জোর করে টাকা আদায়ের ঘটনা ঘটছে। অনেক ছাত্রছাত্রীই ছাত্রনেতাদের দাবি মতো তোলার টাকা দিতে না পেরে পছন্দমতো কলেজে ভর্তি হতে পারছে না। অভিভাবকরা বাধ্য হচ্ছেন এই তোলাবাজ ছাত্রনেতাদের দাবি মেটাতে। সিপিএম আমলেও কলেজে ছাত্র ভর্তির সময় শাসক দলের ছাত্রনেতাদের দাপট দেখা গেছে। তারা অবশ্য নতুন ছাত্রছাত্রীদের নিজ ইউনিয়নের দিকেই টানার চেষ্টাটি করতেন। এই জমানার মতো প্রকাশ্যে কলেজে বসে তোলাবাজি করতেন না। কলেজের অধ্যক্ষ

থেকে শিক্ষক— সকলেই অসহায়ভাবে এই তোলাবাজি প্রত্যক্ষ করছেন। প্রতিবাদ করতে গেলে যে নিগৃহীত হতে হবে, সে ধারণা তাঁদের আছে। এ জমানায় ঘন ঘন শিক্ষক নিগ্রহ এবং নিগ্রহকারীকে 'ছেলেমানুষ' বলে প্রশ্রয় দেওয়ার চল যে রয়েছে, তা শিক্ষকসমাজ জানেন।

এখন ভাবার বিষয়, কলেজে কলেজে এই তোলাবাজ ছাত্রনেতাদের দাপাদাপি যখন চলছে, টাকার বিনিময়ে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার মতো চূড়ান্ত অনৈতিক কাজ যখন প্রকাশ্যেই চলছে— তখন এই রাজ্যের বিবৃতিবাজ শিক্ষামন্ত্রী কী করছেন? তাঁর দলের ছাত্রনেতাদের এই তোলাবাজি তিনি কি বন্ধ করতে পেরেছেন? শিক্ষামন্ত্রী মাঝে অবশ্য একবার হুঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন— টাকা নিয়ে ভর্তির কোনও অভিযোগ পেলে তিনি কঠোর পদক্ষেপ নেবেন। তাঁর এই হুঙ্কার দেওয়ার পর অনেক অভিযোগই প্রকাশ্যে এসেছে। অনেক ঘটনাই সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। কোনও কোনও কলেজে তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্রনেতারা এই তোলাবাজি চালাচ্ছেন— তাও প্রকাশ্যে এসেছে। কিন্তু কী করেছেন শিক্ষামন্ত্রী? বন্ধ করতে পেরেছেন ছাত্রনেতাদের এই দাপাদাপি? পারেননি তো। তাঁর হুমকিকে কার্যত উপেক্ষা করেই ছাত্রনেতারা প্রকাশ্যেই তোলাবাজি চালিয়ে যাচ্ছে। এই তোলাবাজ ছাত্রনেতাদের কাছে তিনি যে মোটেই গুরুত্ব পান না, তা আর বুঝিয়ে বলার কোনও দরকার নেই। বরং, একবার হুঙ্কার দেওয়ার পর শিক্ষামন্ত্রী এখন রাজ্যের শিক্ষাচিত্র থেকে মুখ ঘুরিয়ে বিজেপি সভাপতির ভাষণের প্রতিক্রিয়া দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। যাঁর কথাকে তাঁর দলের ছাত্র নেতারাই পাত্তা দেন না, তাঁর থেকে বড় 'শূন্য কলসি' আর কেউ আছে নাকি এই ভূ-ভারতে?

তবে, একটি সংশয়ও আছে। রাজ্যের কলেজগুলিতে নিজের দলের ছাত্রনেতাদের এই তোলাবাজি বন্ধে শিক্ষামন্ত্রী কতখানি আন্তরিক? বা, সত্যিই আন্তরিক কিনা। তৃণমূল জমানায় কলেজ ভর্তিকে কেন্দ্র করে এমন একটি তোলাবাজি যে শুরু হতে পারে, সেই আশঙ্কা করে এই সরকারের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু গোড়া থেকেই অনলাইনে ভর্তির পক্ষে ছিলেন। কিন্তু ব্রাত্যবাবুর এই প্রস্তাবে প্রমাদ গণেছিলেন দলের ছাত্রনেতারা। ওই ছাত্রনেতাদের সুরে সুর মিলিয়েছিলেন দলের প্রতিষ্ঠিত কিছু নেতাও। টাকা কামানোর এমন সহজ পন্থাটি হাতছাড়া হোক তাঁরা চাননি। 'সততার প্রতীক' বলে প্রচারিত দলের সভানেত্রীরও মনে হয়েছিল স্বচ্ছতা বজায় রাখার থেকেও বেশি দরকার দলের এই ক্যাডারকুলকে হাতে রাখা। তাতে তাদের যদি কিছু কামিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়— তাতেই বা ক্ষতি কী? অতএব ব্রাত্যবাবুকে পত্রপাঠ বিদায় জানিয়ে পার্থবাবুকে শিক্ষামন্ত্রী রূপে বরণ। ওইদিনই তোলাবাজ ছাত্রনেতাদের কাছে এই বার্তাটি পৌঁছে গিয়েছিল যে, তাদের করেকম্মে খাওয়ায় প্রশাসন আদৌ কোনও বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

অনলাইনে ভর্তির প্রক্রিয়া তার অনেক পরে শুরু হয়েছে বটে, কিন্তু বিষ যা মাথায় ওঠার তা প্রথমদিনই উঠে গিয়েছিল। কাজেই অনলাইনে ফর্ম ফিলআপ করলেও তোলাবাজ ছাত্রনেতাদের হাতে টাকা গুঁজে না দিলে এখন কলেজের দরজা বন্ধ। কিছুদিন আগে তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় কর্মী সভায় ছাত্রভর্তির এই তোলাবাজি বন্ধ করার হুমকি দিয়েছেন। তাতেও তোলাবাজি বন্ধ হয়নি। একথা কোনও শিশুও বিশ্বাস করবে না যে, মুখ্যমন্ত্রী বা শিক্ষামন্ত্রী ইচ্ছা করলে এই তোলাবাজি বন্ধ করতে পারেন না। প্রথমত, যেসব কলেজে যেসব ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠছে, তাদের সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে অনায়াসেই দল থেকে বহিষ্কার করা যায় তাদের। দ্বিতীয়ত, ব্যাপক পুলিশি অভিযান চালিয়ে এই তোলাবাজ ছাত্রনেতাদের গ্রেপ্তার করা যায়। এই দুটি পদক্ষেপ নিলেই সাধারণ ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং শিক্ষক সমাজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে। কিন্তু শুধু মৌখিক হুমকি দেওয়া ছাড়া মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী কোনও কঠোর পদক্ষেপ এখনও পর্যন্ত করেননি। ফলে তোলাবাজ ছাত্রনেতারাও বুঝে গেছে, লোক দেখাতে ওই হুমকিটুকুই শুধু দেওয়া। আসলে তাদের কামিয়ে নেওয়ার পথ খুলেই রেখেছে প্রশাসন এবং দল।

শুধু ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তোলাবাজদের দাপট রুখতে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও আন্তরিকতা দেখায়নি। ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হওয়ার ছ'মাসের ভিতর শহর এবং শহরতলিতে অসাধু প্রমোটার, ঠিকাদার এবং সিন্ডিকেটের দাপট বাড়তে থাকে। রাজারহাট, নিউটাউন, বারাসত, বিরাটি, টালিগঞ্জ, গড়িয়া, নাকতলা— শহর এবং শহরতলির বিস্তীর্ণ এলাকায় শুরু হয় সিন্ডিকেটের দাদাগিরি। সেই সঙ্গে প্রতিটি নির্মাণস্থলে দলের মদতপুষ্ট মস্তানদের তোলাবাজি। কোথাও স্থানীয় সাংসদ, কোথাও বিধায়ক, কোথাও বা স্থানীয় কাউন্সিলার— নেপথ্যে মদতদাতা হিসাবে এদের নাম উঠে আসতে থাকে। তোলাবাজি এবং সিন্ডিকেটকে কেন্দ্র করে এলাকায় এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী সংঘর্ষও হয়। খুন-জখমের ঘটনাও ঘটে। তোলাবাজদের হাতে নিগৃহীত হন সাধারণ মানুষ। এসব কিছু যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জানেন না— এমন নয়। ২০১১ থেকে এপর্যন্ত মাঝেমাঝেই নিয়ম করে তিনি বলে গিয়েছেন— এই তোলাবাজি এবং সিন্ডিকেট তিনি বরদাস্ত করবেন না। দলীয় নেতাদের এসব থেকে দূরে থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু কথাই সার। এসবের পরেও তোলাবাজি আর সিন্ডিকেটের দাপট বিন্দুমাত্র কমেনি। তৃণমূল নেতারাও আগের মতোই তোলাবাজদের পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছেন। শুধু এটুকুই প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর পার্থ চট্টোপাধ্যায়রা শুধুই গর্জান, কখনও বর্ষান না। সম্প্রতি দলের কর্মীসভায় তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী বলেছেন, দলের নামে চাঁদা তুললে ৭৫ শতাংশ দলকে দিয়ে নিজে ২৫ শতাংশ রাখুন। তোলাবাজির এমন ঢালাও অনুমতি এর আগে আর কেউ কখনো দিয়েছেন কি? ■

মোদী সরকারের বিদেশনীতি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

ড. নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিত

এটা ঠিক যে, বিদেশনীতি এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুটো পৃথক্ বিষয়। কিন্তু এই দুটো বিষয় অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, দুটোকে একই লক্ষ্যে যুক্ত করতে হয়। কৌশলী ও বিচক্ষণ বিদেশনীতি আন্তর্জাতিক স্তরে যেমন মিত্র সংগ্রহে সাহায্য করে, তেমনি বিদেশের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকেও মজবুত করতে পারে।

সাম্প্রতিক কালে মোদী সরকার অত্যন্ত বাস্তববোধ, সচেতনতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে এই দুই লক্ষ্যের দিকে অভাবিতভাবে এগিয়ে গিয়েছে। বলাবাহুল্য, নেহরুর আমল থেকে যে আবেগধর্মী, তত্ত্ব-ঘেঁষা ও পক্ষপাতদুষ্ট বিদেশনীতি গৃহীত হয়েছে, তাকে বিদায় দিয়ে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার দেশের স্বার্থ অনুসারে একটা বাস্তবমুখী, জীবন্ত ও কৌশলী বিদেশনীতি গ্রহণ করেছে এবং সেই সঙ্গে বিদেশি সাহায্যে ও অভ্যন্তরীণ প্রয়াসে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অত্যন্ত শক্তিশালী ও সময়োপযোগী করে তুলেছে।

যাঁরা শ্রীমোদীকে গালিগালাজ না করে কোনও ধরনের জলপান করেন না, তাঁরা কিন্তু এটা জানেন না বা ব্যাপারটা তাদের বোধগম্য হয়নি।

আমাদের দুই প্রতিবেশী দেশ চীন ও পাকিস্তান আমাদের শত্রু হয়ে উঠেছে। পাকিস্তান তিনবার (১৯৪৭, ১৯৬৫ ও ১৯৭১) ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তবে যুদ্ধে সুবিধে না হওয়ায় সেই দেশ নিয়েছে নিরন্তর অন্তর্ঘাত, বিস্ফোরণ, সীমান্ত লঙ্ঘন ইত্যাদির নীতি। আর চীন কয়েক শতাব্দীর মিত্রতা ভুলে সম্প্রসারণের নীতি নিয়ে ভারতের ২৫,০০০ বর্গ মাইল জমি দখল করে ১৯৫৪ সালে---(*ভি. এন. খান্না---ফরেন পলিসি অব ইন্ডিয়া, পৃ:* ১১১)।

চীন আবার ১৯৬২-র শীতকালে এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে ভারত আক্রমণ করে। ভারতের অপ্রস্তুতির সুযোগ নিয়ে চীনাবাহিনী অসম পর্যন্ত চলেও এসেছিল (*কে. বি. কেশওয়ালী —ইন্টারন্যাশানাল রিলেশানস্, পৃ: ৫৮০*)। পরবর্তী কালে চীন অরুণাচল, সিকিম ইত্যাদি নিয়ে বিবাদ করেছে, ভারতের পরমাণু গবেষণার নিন্দা করেছে, পাক-ভারত যুদ্ধে ভারতকে হুমকি দিয়েছে এবং কমিউনিস্ট দেশ বলে দাবি করেও মার্কিন দোসর পাকিস্তানের সঙ্গে মিত্রতা করেছে অন্ধ ভারত বিরোধিতার কারণে।

এই ত্রিভুজ প্রতিকূলতাকে প্রতিহত করা একান্ত দরকার। কিন্তু এই দুটো দেশই পরমাণু শক্তিধর। এই কারণে ভারতেরও দরকার কূটনৈতিক জগতে মিত্রতা বৃদ্ধি এবং বিশেষ করে, সামরিক সমৃদ্ধি। এস. ক্লিমেন্ট মন্তব্য করেছেন, 'Let us defend the sovereignty and integrity of our motherland. We are compelled to alter our views to-day. If we desire peace, let us immediately prepare for a thermo-nuclear warfare.'---(*ইন্টারন্যাশনাল রিলেশান্স, পৃ:* ২১২—১৩)।

মোদী সরকার একদিকে যেমন ওই দুই দেশকে কোণঠাসা করতে চেয়েছে কূটনৈতিক জগতে, তেমনি সামরিক শক্তিবৃদ্ধি করে এনে দিয়েছে নিরাপত্তাবোধ।

প্রথমত, এবারের বিশ্ব সম্মেলনে ভারতের বিরাট কূটনৈতিক জয় হয়েছে। পাঁচ দেশের (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা) এই বৈঠকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। সবাই জানেন, পাকিস্তানই হলো এর আঁতুরঘর, সুতরাং প্রকারান্তরে তাকেই যৌথভাবে লক্ষ্য হিসেবে ধরা হয়েছে। তাৎপর্যের বিষয় হলো, গত বছরে ভারতের গোয়ায় চীন এই প্রস্তাব ভারতকে তুলতেই দেয়নি। কিন্তু চীনে বসেই চীনকে এটা মেনে নিতে হয়েছে। তাছাড়া তার আপত্তি সত্ত্বেও ভারতকে এন. এস. জি.-তে (নিউক্লিয়ার সাপ্লাই গ্রুপ) নেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ভারত এবার ইজরায়েলের সঙ্গেও অনেকগুলো চুক্তি করেছে, আরব অঞ্চলে এই ইহুদি রাষ্ট্র ১৯৪৮ সালে জন্ম নেওয়ায় আরবীয় রাষ্ট্রগুলো তাকে ধ্বংস করার জন্য চারবার যুদ্ধ করেছে। কিন্তু প্রতিবারই এই মহা শক্তিধর রাষ্ট্র তাদের হেলায় পর্যুদস্ত করেছে।

নেহরু থেকে শুরু করে কংগ্রেসের এতদিনের কর্মধারা আরবদের এবং এখানকার মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্য ইজরায়েলকে অচ্ছুত করে রেখেছিলেন। কিন্তু মোদী সরকার ইজরায়েলের সঙ্গে আর্থিক, প্রযুক্তিগত ও পারমাণবিক বিষয়ে বহু চুক্তি করায় আমাদের নানা ধরনের বিশেষত, পারমাণবিক শক্তি অনেকটাই বেড়ে গেছে।

তৃতীয়ত, ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে ৪০ হাজার কোটির মিসাইল কেনার চুক্তি করেছে, তাতে পাকিস্তান ও চীন উভয়ই এখন আতঙ্কিত, কারণ তারা এসে গেছে এই মিসাইলের পাল্লার মধ্যে।

মনে রাখতে হবে, ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়া ছিল নিরপেক্ষ। কারণ চীন ভ্রাতৃসম কমিউনিস্ট দেশ আর ভারত বন্ধু দেশ। এবার কিন্তু রুশ-মিসাইল ব্যবহার করা যাবে চীনের বিরুদ্ধেও।

চতুর্থত, ভারত জাপানের সঙ্গেও অনেকগুলো চুক্তি করেছে। আগে সেই দেশের শর্ত ছিল, পারমাণবিক গবেষণা শান্তির কাজেই লাগতে হবে। এটা লক্ষণীয় যে, এবার কিন্তু সেই শর্ত রাখা হয়নি। বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে এই গবেষণা নিঃশর্তভাবে চালানো যাবে---প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক বিষয়েও তার সঙ্গে হয়েছে বেশ

কিছু চুক্তি।

পঞ্চমত, এতদিন পাকিস্তান ছিল মার্কিন 'স্যাটেলাইট'--- 'সিয়াটো'-র সদস্য। পাক-ভারত যুদ্ধে পাকিস্তান অ্যামেরিকার 'স্যাবার জেট', 'প্যাটন ট্যাঙ্ক' ইত্যাদিও ব্যবহার করেছিল। কিন্তু এবার অ্যামেরিকা পাকিস্তানকে তার সন্ত্রাসবাদের কারণে চরম হুশিয়ারি দিয়েছে, মোদী ট্রাম্প মিত্রতা হয়েছে। তাছাড়া ভারত তার কাছ থেকে ৬টি এ. এইচ.-৬৪ ও অ্যাপোচ্ অ্যাটাক হেলিকপ্টার কিনেছে নৌবাহিনীর জন্য। এর থেকে ভারতের দক্ষিণ প্রান্তের নিরাপত্তা অনেক বেশি বেড়ে গেছে। তাছাড়া এইবার মার্কিন 'গ্লোব'-এর অস্ত্রধারণের বিশেষ ক্ষমতা আছে—মাটি থেকে ৫০০ ফুট ওপরে উঠে টানা ২৭ ঘণ্টা এরা উড়তে পারে।

ষষ্ঠত, চীন ব্রহ্মপুত্রের ওপর বাঁধ তৈরি করতে চাইছে। এতে ভারত আপত্তি জানিয়েছিল---এবার তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশও। বাংলাদেশের হাইকমিশনার দিল্লিতে জানিয়েছেন, তাঁর দেশ এই প্রস্তাব কিছুতেই মেনে নেবে না। তাঁর মতে, চীনের সঙ্গে তার মিত্রতা থাকলেও এক্ষেত্রে দূরত্ব বেড়েছে, আর সেই সঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ সখ্য নিবিড় হয়েছে।

সপ্তমত, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতায় ভারতকে গুরুত্ব দিয়ে আগেই 'প্যাসিফিক কম্যান্ড' নামটা বদলে অ্যামেরিকা 'ইন্দো-প্যাসিফিক কম্যান্ড' নাম দিয়েছিল। এবার এক ধাপ এগিয়ে মোদী মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব জিম ক্যাটিসের সঙ্গেও হৃদ্যতাপূর্ণ বৈঠক করেছেন, সেই সঙ্গে সিঙ্গাপুরের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মহম্মদ সালিকি ওসমানকে নিয়ে জঙ্গি নৌ-ঘাঁটিতে পরিদর্শন করেছেন। দুই দেশের নৌবাহিনীর যৌথ নৌ-মহড়া তাঁরা দেখে খুশিও হয়েছেন।

অষ্টমত, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চীনকে রুখতে ভারত দক্ষিণ ও পূর্ব-এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে জোট গঠন করেছে। এদের মধ্যে আছে ভিয়েতনাম, ফিলিপিন, মালয়েশিয়া, ব্রুনেই, তাইওয়ান ইত্যাদি দেশ। তিন দিনের সফরে গিয়ে শ্রীমোদী ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে একটা বন্দরচুক্তি করেছেন। সিকি দশক ধরে ভারত সিঙ্গাপুরের সঙ্গেও নৌ-মহড়া চালাচ্ছে। ভিয়েতনামের সঙ্গেও বন্ধন দৃঢ় হয়েছে—একযোগে কাজ করতে রাজি হয়েছে এই দুই দেশ।

এভাবেই বিভিন্ন দেশের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে তুলে ভারত কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, নেপাল, নেদারল্যান্ডস্ ইত্যাদি দেশের সঙ্গেও ঘটেছে মৈত্রীবন্ধন। তার ফলে পাকিস্তান-চীনের বৈরিতাকে রুখে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে--- প্রায় কোণঠাসা হয়ে গেছে দুই আগ্রাসী দেশ। আর তার ফলে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও হয়েছে মজবুত।

কিন্তু শুধু এভাবে নয়। পোখরানে ভারত অনেক আগেই পারমাণবিক গবেষণায় সাফল্য পেয়েছিল, হয়ে উঠেছিল শক্তিধর দেশ। তাছাড়া ভারত নিজস্ব প্রয়াসে 'বৈজয়ন্ত' নামে ট্যাঙ্ক বানিয়েছে। আর সম্প্রতি পরমাণু-অস্ত্রধারী 'অগ্নি-৫' ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষায়ও পেয়েছে অভাবনীয় সাফল্য। এই ক্ষেপণাস্ত্র ৫,০০০ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করতে পাবে। তার ফলে কম্পিত হয়েছে পাক- চীনের অন্তরাত্মা। ভারত এবার ঢুকে পড়েছে মহাশক্তিধর পরমাণু শক্তিধর দেশের তালিকায়।

মোদী সরকার দেখিয়ে দিয়েছেন—নেহরু আমলের আবেগধর্মী ও একপেশে বিদেশনীতি ও নীতিপঙ্গুত্বের কোনও জায়গা বাস্তবে নেই। অসিত সেন মন্তব্য করেছেন, 'Foreign policy must take into account the constant shifts in foreign relations.'—(*ইন্টারন্যাশনাল রিলেশান্স, পৃ: ৬০৩*)। সুতরাং বিদেশনীতি হবে বাস্তবধর্মী, পরিবর্তনশীল, গতিময় ও পরিকল্পিত। এক্ষেত্রে স্বপ্ন, কল্পনা, আবেগ ও উচ্ছ্বাসের কোনও স্থান নেই। নেহরু আবেগপ্রবণ হয়ে চীনের সঙ্গে চিরন্তন মৈত্রীর কথা ভেবে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারত-সীমান্তে সুরক্ষার ব্যবস্থা রাখেননি। সেই সুযোগে চীন ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করেছে ১৯৬২ সালে—(*বি. এন. কল্—দ্য আনটোল্ড স্টোরি, পৃ: ৩৩৭*)। নেহরুর ভাষায়— 'I was roaming in dreamland'—এই অপরাধে তাঁকে তখনই বরখাস্ত করা উচিত ছিল। পরবর্তীকালে অন্য অনেকেই এই স্বপ্নের জগতে বাস করেছেন। কিন্তু নেপোলিয়ান বলেছিলেন—শান্তির কথা বল, কিন্তু বারুদ তাজা রেখো।

অবশ্য সব দেশই কমবেশি মতাদর্শ বা তত্ত্বদর্শনের বিদেশনীতিতে গুরুত্ব দেয়। কিন্তু যাঁরা প্রধানত দেন ক্ষমতার ব্যাপারটাকে, তাঁদের হ্যান্স মর্গেন্থো বাস্তববাদী বলে মনে করেন---(রিলেশান্স অ্যামং নেশনস্)। অবশ্যই তার মধ্যে প্রাথমিক বিষয় থাকা উচিত—জাতীয় স্বার্থ। হার্টম্যানের মতে, 'A Foreign policy is a systematic statement of deliberately selected national interest.'—(*রিলেশান্স্ অব নেশন্স্, পৃ: ২৫২*)। বলা বাহুল্য, মোদী সরকার সেটাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। তত্ত্বাদর্শ, আবেগ ইত্যাদিকে প্রাধান্য না দিয়ে তিনি নিয়েছেন বাস্তবধর্মী পথ।

পাকিস্তান যে-কোনও মূল্যে চায় ভারতের সর্বনাশ, এটাই তার ধ্যান-জ্ঞান। আর লালচীন জন্মের (১৯৪৯) পর থেকেই গ্রহণ করেছে জঙ্গিবাদ। ১৯৫০ সালেই ওই দেশ কোরিয়ার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে—(*এইচ. জি. ওয়েলস—এ শর্ট হিস্ট্রি অব দ্য ওয়ার্ল্ড, পৃ: ৩৪৯*)। ক্রমে চীন তিব্বত দখল করেছে, ভিয়েতনামে যুদ্ধ করেছে, ভারতকে আক্রমণ করেছে। ঐতিহাসিক সি. ভি. এম কেটেল্‌বি লিখেছেন, 'China keeps her hand on Tibet, holds Burma under threat, and extends help to Pakistan as check and counter check to Russia's alliance with India.'—(*এ হিস্ট্রি অফ মর্ডার্ন টাইমস্, পৃ: ৬০*)।

এই অবস্থায় ভারতকে মিত্রসন্ধান করতেই হবে এবং অস্ত্র-শক্তিতে বলীয়ান হতে হবে। মোদী সরকার অত্যন্ত বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে এই কাজ করে চলেছে। এর আগে কোনও সরকারই এই দুই ক্ষেত্রে এত বাস্তববোধ ও পারদর্শিতা দেখাতে পারেনি। ■

জনগণকে ভাবতে হবে কার হাতে দেশের ক্ষমতা দেবেন

বরুণ মণ্ডল

পৃথিবীতে যত রকম শাসন ব্যবস্থা চালু আছে, তার মধ্যে সর্বোত্তম হিসেবে স্থান করে নিয়েছে গণতন্ত্র। কারণ গণতন্ত্রকে বলা হয় জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন। তবে গণতন্ত্র সুশাসন পদ্ধতি তখনই হয়ে উঠবে যখন জনগণ হবে রাজনীতি সচেতন। কারণ গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো জনগণ।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ভারতবর্ষের জনগণ সঠিকভাবে রাজনীতি সচেতন নয়। একটিমাত্র ভোট যে গণতন্ত্রে কতখানি মূল্যবান তা অধিকাংশ জনগণ বোঝেন না। অথবা রাজনীতি বোঝার মতো মন এবং মানসিকতা ভারতীয় জনতার নেই। কারণ ১৯৪৭ সালের পর থেকে ভারতবর্ষ এমন সুশাসন পায়নি যে অধিকাংশ ভারতীয় জনতা 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়' অবস্থা থেকে মুক্তি পায়। একদল রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী রাজনীতিকে পেশা ভেবেছেন। ফলে যাতে তারা ক্ষমতার সিংহাসনে দিনের পর দিন অবস্থান করতে পারেন, সেই ভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতীয় জনতাকে রাজনীতি সচেতনতা থেকে কৌশলে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে অর্ধ শতক ধরে। ইতিহাস বিকৃতি থেকে স্বজনপোষণ, সমস্ত কিছুই পরিকল্পনা মাফিক করে এসেছে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের কর্তাব্যক্তিরা। কাগজে-কলমে গণতন্ত্র হলেও মূলত পরিবারতন্ত্র ভারতবর্ষকে শাসন করে এসেছে। যা একনায়কতন্ত্রের নামান্তর। ফলে গণতন্ত্রকে সামনে রেখে একনায়কতন্ত্র বা রাজতন্ত্রকে ভারতের মানুষ লালন পালন করে এসেছে। রাজতন্ত্রে যেমন জনগণ নিজেকে প্রজা হিসেবে শাসকের দয়াদাক্ষিণ্যে দিনাতিপাত করে, ঠিক তেমনি ভারতীয় গণতন্ত্রে মানুষ ভাবতে শেখেনি যে রাষ্ট্র জনগণকে দয়া করে না, অধিকার দান করে। ফলে রাষ্ট্রনেতারা কল্যাণমূলক কাজগুলিকে মানুষকে দান খয়রাত ভাবতে শিখিয়েছে। তাই আজও স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও মানুষকে ২ টাকা প্রতি কেজি দামের চাল নিতে লাইনে দাঁড়াতে হয়। স্কুলে বই খাতা সাইকেল ফ্রিতে নেওয়ার জন্য তদবির করতে হয়। যে রাজনৈতিক দল ফ্রি তে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস দান করে তারাই হয়ে ওঠে আদর্শ রাজনৈতিক দল। তাই বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল দল বিগত বামপন্থী সরকারের ১ লক্ষ ৮৪ হাজার কোটি টাকা ঋণকে ছাপিয়ে ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার কোটি টাকা ঋণ করেছে, তবুও তৃণমূল দলের প্রতি বঙ্গবাসীর সমর্থন কমেনি। কারণ বর্তমান ক্ষমতাসীন তৃণমূল দলটি মানুষের জন্য দান-খয়রাতে ব্যস্ত। প্রতি লিটার পেট্রো পণ্য ৪০ টাকায় কিনে ৮০ টাকা দামে বিক্রি করলে জনগণের মাথাব্যথা নেই। তাঁরা ভাবেন দেশ চালাচ্ছে শত্রুরা। অথচ ৩২ টাকা দামের চাল কেজি প্রতি ২ টাকাতে দিলে কোও প্রতিবাদ নেই। বাকি ৩০ টাকা আসছে কোথা থেকে? ভাববার সময় নেই, ভাবানোরও কেউ নেই।

ভারতীয় জনতা স্বপ্ন দেখে 'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'। অথচ সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য কষ্টসহিষ্ণু হতে কষ্ট হয়। একমাত্র যুক্তি, রাজনৈতিক নেতারা জনগণের করের টাকায় বিদেশি ব্যাঙ্কে কালো টাকার পাহাড় গড়েছেন। ভারত পুনর্নির্মাণের

একমাত্র দায় নেতাদের। পূর্বেই বলেছি, গণতন্ত্রের মূল কারিগর দেশের জনতা। তাদের সমর্থনের জোরেই রাজনৈতিক নেতারা দেশ শাসন করছেন। ছদ্মবেশী রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিদের আপাত মধুর ভাষণে মোহিত হয়ে দেশ শাসনের ভার তাদের হাতে কেন তুলে দেবেন? সুতরাং তাদের এই ক্ষমতাহীনতা এবং দারিদ্র্যের দায় থেকে তারাও মুক্ত হতে পারেন না। নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে হলে চোখ কান খোলা রাখা দরকার। নগদ নারায়ণ এবং সংকীর্ণ মানসিকতা দিয়ে না দেশের উপকার হয়, না নিজেদের।

পিছিয়ে পড়া দেশ ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দামোদরদাস ভাই মোদী দিনাতিপাত করছেন। লোভী বিরোধীরা তার বিদেশ ভ্রমণ এবং তার অমানুষিক পরিশ্রমকে ব্যঙ্গ করছেন। একজন প্রধানমন্ত্রীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য কি বিদেশ ভ্রমণ হতে পারে? ভ্রমণ পিপাসু মনের তৃষ্ণা নিবারণ করতে কি বিদেশ ভ্রমণ? রাজনীতি বর্তমানে শুধুমাত্র একটি দেশে আবদ্ধ নয়, দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক

হয়ে উঠেছে। তাই শত্রু দেশগুলির বিরুদ্ধে লড়াই এবং সম্মান আদায়ের জন্য দূরবর্তী দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব একান্ত জরুরি। অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীন দেশেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সাধারণ মানুষ স্বাগত জানিয়েছে, শত্রু দেশের থেকে আর কী আশা করা যেতে পারে?

নরেন্দ্র মোদী ডাক দিয়েছিলেন অচ্ছে দিন আনার। বিরোধীপক্ষ এমন করছে যেন অচ্ছে দিনের অপেক্ষায় ভারতবাসী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। প্রশ্ন হলো , প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু থেকে শেষ কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের ৪৭ বছর দেশ শাসনে কেন ভারতবাসীর অচ্ছে দিন আসেনি? ৪৭ বছরেও ভারতবাসী কেন অচ্ছে দিনের অপেক্ষায় ক্লান্ত হয়ে পড়েনি?

এক নতুন ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখতে হলে ভারতবাসীকে নতুনভাবে ভাবতে হবে। সরকার শুধুমাত্র ফ্রিতে কী দিল তা নিয়ে মেতে থাকলে ভারত গড়ে উঠবে না। আর নতুন ভারত বলতে সেই ভারতকে বোঝাবে, যে-স্বাধীন ভূখণ্ডে কোনও ভারতবাসী রাষ্ট্রীয় ভিক্ষায় দিনাতিপাত করবে না। অন্ত্যোদয় যোজনার প্রয়োজন পড়বে না। ঘুষ দিয়ে চাকরি হবে না। মদ বিক্রিতে রাজ্য প্রথম হবে না। নিরাপদে মহিলা পুরুষ উভয়ই ভারত ভ্রমণ করতে পারবে। পুলিশকে দেখে সাধারণ মানুষ ভয় পাবে না। দুর্নীতিবাজকে দেখে মানুষ পাথর ছুঁড়বে, ভারত রক্ষাকারী সেনাবাহিনীদের উপর পাথর ছুঁড়বে না। 'ভারত তেরে টুকরে করেঙ্গে' কেউ বলবে না। কাশ্মীরকে ভারত থেকে যারা বিচ্ছিন্ন করতে চায় তাদের কেউ সমর্থন কেউ করবে না। দেশের আগে কেউ নিজেকে সেরা ভাববে না। তবেই তো ভারত গড়ার স্বপ্ন পূরণ হবে। সেই শান্তির নীড় সুস্থ সংস্কৃতির নীড় ভারতবর্ষে ভেদাভেদ ভুলে সত্যিকারের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা ভোগ করবে সুসভ্য ভারতবাসী। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য, প্রাচীন সংস্কৃতি আবার সারা বিশ্বকে শাসন করবে। জীবনের পথ দেখাবে ভারতীয় সংস্কৃতি।

এইসব স্বপ্নপুরণের অগ্রদূত কে হবেন? এটাই এখন বহু মূল্যবান প্রশ্ন।

সেই স্বপ্নের ভারতবর্ষ গড়তে ভারতীয় জনগণ অর্ধশতকেরও বেশি সময় দিয়েছেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে। কিন্তু সেই স্বপ্ন পূরণ তারা করতে পারেননি। অন্যতম কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদ বলছেন, ভারতীয় সেনা জঙ্গির থেকে সাধারণ নাগরিককে বেশি খুন করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, দেশের সৈনিকদের উপর পাথর ছোঁড়ে যে সমস্ত মানুষ, যারা ভারতে থেকে পাকিস্তানের পতাকা নিয়ে মিছিল করে; তারা কি নিরীহ মানুষ? আরেকজন কংগ্রেস নেতা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সৈফুদ্দিন সোজ সম্প্রতি দাবি করেছেন, ভারত থেকে কাশ্মীরকে আলাদা করা উচিত। এই সমস্ত নেতাদের দিয়ে কি ভারতের সত্যিকারের উন্নয়ন হবে বলে মনে হয়?

ভারতবর্ষ জুড়ে যত আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল রয়েছে তারা সবাই স্বজনপোষণে জড়িত। অধিকাংশের রাজনীতিই মূল পেশা। কোটি কোটি টাকার মালিক এখন তারা। গান্ধী পরিবার থেকে শুরু করে কেজরিওয়াল সবাই এখন টাকার কুমির। এবং মজার ব্যাপার রাজনৈতিক দলগুলির সুপ্রিমো যারা তারা সবাই তাদের সন্তানদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাজনীতিকেই পাখির চোখ করে রেখেছেন। লালুপ্রসাদ যাদব তার পুত্র তেজস্বী যাদবকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন, মুলায়ম সিংহ যাদব আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন পুত্র অখিলেশ যাদবকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। দেবেগৌড়া চেষ্টা করেছেন কুমারস্বামী দেবেগৌড়াকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী এখনো চেষ্টা করছেন তার একমাত্র পুত্র রাহুল গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। অগ্নিকন্যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে তাঁর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রাণপাত করছেন। বড় দুঃখের কথা, এঁরা সন্তানস্নেহে এতই অন্ধ যে এদের স্বপ্ন পূরণের জন্য যা কিছু তাই করতে পারেন। এই নেতারা এই মুহূর্তে একত্রিত হয়েছেন, বর্তমান ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্দেশ্যে। এঁরা কেউ পাকিস্তান বা মুসলমান জঙ্গি সংগঠনের বিরুদ্ধে একটা কথাও বলেন না, অথচ নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে এঁদের বাগ্মিতা অতুলনীয়।

অন্যদিকে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী এবং তার রাজনৈতিক ও পারিবারিক সংস্কৃতির দিকে আমাদের নজর দেওয়া উচিত। তারপর ভাববো, নতুন ভারত গড়ার দায়িত্ব তাকে দেওয়া যাবে কিনা। ১০ বছর মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। চার বছর ধরে প্রধানমন্ত্রীর পদে রয়েছেন। এখনো পর্যন্ত ব্যক্তিগত স্তরে দুর্নীতির আঁচ পাওয়া যায়নি। ভারতীয় ইতিহাসে যা একটি অকল্পনীয় ঘটনা।

মোদীজীর এক ভাই এখনো চা বিক্রি করেন, আরেক ভাই পুরনো লোহা লক্কড়ের ব্যবসা করেন, নিজের বোনের বর বাসের কন্ডাক্টারি করেন। যার শালা কিনা দেশের প্রধানমন্ত্রী, যার ভাই বা দাদা কিনা দেশের সর্বময় কর্তা তারা আজ রুটি-রোজগারের জন্য নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী সমাজের সাধারণ মানুষের মতো কর্ম করেন। এটা আমরা যেমন ভাবতে পারি না, গান্ধী পরিবার, যাদব পরিবার, দেবগৌড়া পরিবার বা বাংলার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবাররাও ভাবতে পারবেন না। কারণ তাদের কাছে রাজনীতি মানে রাজার নীতি নয়, রাজনীতি তাদের কাছে লুটে খাওয়ার পথ। কিছুদিন পূর্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো দুর্ঘটনাজনিত চোখের অপারেশনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করলেন, আশ্চর্য হইনি। অথচ অনতি সাম্প্রতিকে নরেন্দ্র মোদীর ভাইঝি যিনি কিনা অঙ্গনওয়াড়ির একজন কর্মী, বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন, আমরা এ খবর পাইনি। কারণ ভারতীয় মিডিয়া এটাকে খবর মনে করে না।

সুতরাং ভারতীয় জনগণকে ভাবতে হবে কাকে দেশের দায়িত্ব দিলে দেশ এগিয়ে যাবে। যে সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং তাদের কর্মীরা ভারতকে টুকরো করে দেওয়ার মতবাদে বিশ্বাসী নেতাকে প্রশংসা করে, জঙ্গি মারা গেলে কেঁদে ভাসায়, দেশ রক্ষাকারী সেনাকে অত্যাচারী ও রেপিস্ট আখ্যা দেয়, দুর্নীতি রোধের অস্ত্র আধারকে বাতিল করতে বলে, নিজেদের দেশে মাটিতে পাকিস্তানের পতাকা ওড়ায়...তাদের হাতে দেশ শাসনের ভার তুলে দেওয়া আত্মঘাতী কাজ হবে না কি? ■

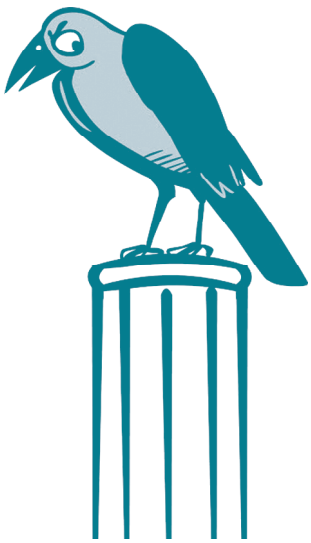

আমারি বঁধুয়া আনবাড়ি যায়

ইংরেজ নাট্যকার সেক্সপিয়র একটি মনোজ্ঞ নাটক লিখেছেন, Much ado about nothing আমাদের শাস্ত্রেও যে আছে, প্রভাতে মেঘাড়ম্বরে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তো আমরা নিত্যদিনই পাচ্ছি। তবে সম্প্রতি আমাদের রাজনীতিতেও তার একটি মহা মহড়া হয়ে গেল, নাগপুরে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৃতীয়বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যোগদান উপলক্ষ্যে। কংগ্রেসের সতীশিবিরে তো টি টি পড়ে গেল, Et.tu, Brutas-এর মতো তুমিও প্রণব! আরে ছি ছি ও যে চণ্ডালিকার ঝি। কংগ্রেসের চিরকালের পোঁ-ধরা বামপন্থীরাও শৃগালি ঐকতানে মুখর হয়ে উঠল।

বিশেষ পরিতাপের বিষয়, গান্ধী কংগ্রেসের মহান কুলতিলক যে সংস্থাকে দু'বেলা তুলোধোনা করে রাজনীতিতে ভেসে উঠতে চান, সেকথা খেয়াল রইল না। চিরদিনের কংগ্রেসি সেবক প্রণব মুখার্জির এ কী অধঃপতন যে, কংগ্রেসের জাতশত্রু আর এস এস শিবিরে গিয়ে, প্রতিষ্ঠাতার গলায় মালা চড়ানো! মেঘনাদের কথায় বলতে হয়, 'হে পিতৃব্য ইচ্ছি মরিবারে, বর্বরতা কেন না শিখিলে'; শেষকালে গিয়ে আর এস এসের স্যালুট না নিলে আর চলছিল না।

আমার কী বেদনা তুমি জান, মিতা ওগো মোর মিতা! আমারি বঁধুয়া আন ঘরে যায় আমারি আঙিনা দিয়া।' কংগ্রেসে থেকে রাষ্ট্রপতি পদ পুরস্কার পাওয়ার পর এহেন আচরণ কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না। কেননা জনপথ কংগ্রেসের মহামান্য লিলিপুট নেতা রোজ বলছেন, মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী আর এস এস মুর্দাবাদ। আর এস এসকে কোনও মতে কবজা করতে পারলেই নাকি এই গান্ধী কুলতিলকের আর প্রধানমন্ত্রী হয়ে দেশ সেবার বাধা থাকবে না। কেননা তিনি সার বুঝেছেন, প্রধানমন্ত্রী হতে না পারলে দেশ সেবার মহান দায়িত্ব পালন করা যায় না।

আর দেশের সেই অচ্ছুত কন্যা, আর এস এসের খোদ শিবিরে গিয়ে তাদেরকে বহুত্ববাদের পাখি পড়ানোর চেষ্টা বৃথা। শুধু তাই নয়, আর এস এসের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারকে স্বাধীনতা সংগ্রামী মহান নেতা বলে তাঁর বাড়িতে গিয়ে মাল্যভূষিত করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। খেয়াল রইল না যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের সোল এজেন্ট একমাত্র কংগ্রেস, কংগ্রেস এবং কংগ্রেস। আর তার একমাত্র উত্তরাধিকারী না বিইয়ে কানাইয়ের মা, ইতালিয়ান গান্ধী ও তস্য তনয় অর্বাচীন গান্ধী।

প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ফলে, তাঁর অবশ্য দেশের কিছু ইতিহাস-ভূগোল জানা আছে। তিনি বিলক্ষণ জানেন, স্কটল্যান্ডের শতাব্দীপ্রাচীন মদ কোম্পানি কিংবা জাপানের মোটর গাড়ি কোম্পানির উত্তরাধিকার স্বত্বের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামের কোনও উইলকরা উত্তরাধিকার জন্মায় না। ঠাকুর্দা কবে স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘি খেয়ে গেছেন, এখনও তা হাতে লেগে আছে, দাবি করার বুজরুকি নেহাতই হাস্যকর। স্বাধীনতা আন্দোলনের যে কংগ্রেস মঞ্চ জাতীয় জীবনে মুক্তির সন্ধান দিয়েছিল, মূল্যবোধের রাজনীতিতে স্বাধীন ভারত নির্মাণে ব্রতী হয়েছিল, সাতষট্টি সালেই তার অবসান ঘটে। এ কংগ্রেস সে কংগ্রেস নয়; জাতীয় কংগ্রেস ভেঙে প্রথমে হয় ইন্দিরা কংগ্রেস, তারপর বিজাতীয় কংগ্রেস এবং ডাইন্যাসটিক ডেমোক্র্যাসির দৌলতে এখন সেটি জনপথ কংগ্রেসে পরিণত। অপোগণ্ড নেতৃত্বে এখন সেখানে চলছে রাজনৈতিক মাদারির খেল।

যে মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারীর অপবাদের তকমা দিয়ে আর এস এসের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তার সত্যাসত্য নির্ণয় একদা আদালতে ও ভরত সরকারের দরবারে হয়ে গেছে। মিশরের তুতেনখামের পিরামিড থেকে তোলা ম্যমি দিয়ে মিউজিয়াম চলতে পারে কিন্তু জীবন নয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির কাল থেকে মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর ভাবনাকে কেউ যদি হত্যা করে থাকে নিঃসন্দেহে সে হচ্ছে কংগ্রেস। মহাত্মা একদা বলেছিলেন, ভারত বিভাগ একমাত্র তাঁর মৃতদেহের ওপর দিয়ে হবে। কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতা গান্ধীকে পাশ কাটিয়ে যেদিন গান্ধীশিষ্য নেহরু-প্যাটেল প্রমুখ মহা মহা নেতা দেশভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেদিনই গান্ধীকে সজ্ঞানে হত্যা করা হয়। স্বাধীনতার পর ভারতীয় গান্ধীর পরমপ্রিয় ব্রিটিশ শিষ্য নেহরু জনসেবকের ভূমিকা বাদ দিয়ে বাদশাহি মেজাজে দেশ চালাতে থাকেন। ফলে গান্ধীজির গ্রামস্বরাজ বা সর্বনিম্নস্তর থেকে গণতন্ত্র কথা স্বাধীন ভারত নির্মাণের সমস্ত ভাবনাকে কবর দিয়ে, ব্রিটিশ ধাঁচে পার্লামিন্টারি ডেমোক্র্যাসি তথা বৃহৎ শিল্পায়নে ব্রতী হন। গান্ধীভাবের প্রতি পদে পদে হত্যা দিয়ে স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস রাজত্বের শুরু।

তবু রাজ্যে রাজ্যে সৎ গান্ধীবাদীরা নেতৃত্বে থাকায় অন্তত সাতষট্টি সাল অবধি ভারতে মূল্যবোধের রাজনীতি ও জনমতনির্ভর গণতান্ত্রিক ধারা শিকড় গাড়তে শুরু করে। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর উত্থানের সঙ্গে সেসব অন্তর্হিত হয়ে লুম্পেন ও স্তাবকতা পুষ্ট স্বেচ্ছাচারী রাজনীতিতে, দেশ চোর-জোচ্চোরদের মৃগয়াক্ষেত্র হয়ে ওঠে। শতাব্দীপ্রাচীন গণতান্ত্রিক জাতীয় কংগ্রেসকে ভেঙে ইন্দিরার প্রথম ধ্বংসাত্মক কাজ জাতির পিতাকে রাজঘাটে বিশ্রাম লাভ করতে পাঠায়।

শুধু তাই নয়, নগ্ন স্বেচ্ছাচারিতায়, জরুরি অবস্থার সুযোগে বামপন্থী ভজকেষ্টদের কুপরামর্শে এমনকী সংবিধানের প্রিঅ্যামবেলে, নির্বোধের মতো, সোশ্যালিস্ট ও সেকুলার শব্দ দুটি জুড়ে দিয়ে ইন্দিরা মহান বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেন। ভারত যে কী অর্থে সোশ্যালিস্ট

দেশ তা বোঝা শিবের বাবারও অসাধ্য আর সেকুলার দেশে কী করে ধর্মের ভিত্তিতে মোল্লা তোষণে সরকারি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাও বোঝা দুষ্কর। তাছাড়া ভোটের সময় কেন যে মোল্লা, ইমামদের দরগায় সিন্নি চড়ানোর ধুম পড়ে যায় কে জানে। এখন খান সাহেবের নাতি ও খেরেস্তানের পুত্র গলায় পৈতে চড়িয়ে সেকুলার মহামতি হয়ে ওঠেন। গান্ধী পরিবার কংগ্রেসি উত্তরাধিকারে বোফর্স থেকে আরম্ভ করে ন্যাশনাল হেরাল্ডের মামলায় জামিন পাওয়া পর্যন্ত যেন সততার প্রতিমূর্তি। প্রণব মুখোপাধ্যায় যথার্থভাবেই ড. হেডগেওয়ারকে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও দেশ নেতারূপে অভিনন্দিত করায় কংগ্রেসের অনেক ত্রিবর্ণ শৃগালের গাত্রদাহ হয়েছে। তাঁদের ধারণা স্বাধীনতা সংগ্রাম নাকি কংগ্রেস নামধারীদের পারিবারিক সম্পত্তি। এই অতি বুদ্ধিমান গর্দভবৃন্দের জানা উচিত, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় জাতীয় কংগ্রেসে হীন দলীয় রাজনীতির আশ্রয় ছিল না। নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের বিবাদে ক্ষুব্ধ সিস্টার নিবেদিতা বেনারস কংগ্রেসে উপস্থিত থেকে ঘোষণা করেছিলেন, কংগ্রেস হচ্ছে দলমত নির্বিশেষে স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐক্যমঞ্চ। সেখানে একটিই সংগ্রামের মন্ত্র, লড়তে হবে একসাথে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে।

তাই দেখা যায় কংগ্রেস স্বাধীনতা আন্দোলন মঞ্চে একাধিক ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর সহাবস্থান। তারা কংগ্রেসের ভেতরে ও বাইরে থেকে সংগ্রামে শামিল হয়েছেন। সেখানে যেমন ছিল চরমপন্থী ও নরমপন্থী, স্বরাজ পার্টি ও অসহযোগীরা, সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট পন্থীরা এবং আবুল কালাম আজাদের মতো মুসলমান ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মতো হিন্দু পুনর্জাগরণের নেতারা। গান্ধীজীর ডাকে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সোশ্যালিস্ট নেতারা যেমন গোপনে আন্দোলন পরিচালনা করে ব্রিটিশ শাসকদের নাড়া দিয়েছিলেন, দেশদ্রোহী কমিউনিস্টরা ব্রিটিশের চর হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের পিঠে ছুরি মেরেছেন। কংগ্রেসি স্বাধীনতা সংগ্রামের একমাত্র উত্তরাধিকারের দাবি নিয়ে যারা আস্ফালন করেন, প্রথমত বুঝতে হবে এই কংগ্রেস সেই কংগ্রেস নয় এবং এই কংগ্রেসের নেতাদের তখন জন্ম হয়েছিল কিনা সন্দেহ, সংগ্রাম করা তো দূরের কথা।

সঙ্ঘ কোনওদিন স্বাধীনতা সংগ্রাম করেনি বলে যে অশিক্ষিতরা গলা ফাটায়, প্রণব মুখোপাধ্যায় হেডগেওয়ারকে স্বাধীনতা সংগ্রামী মহান নেতা সম্বোধন করে তাদের মুখের মতো জবাব দিয়েছেন। ডাঃ হেডগেওয়ার কলকাতায় ডাক্তারি পড়ার সময়েই তখনকার স্বদেশি আন্দোলনে উত্তাল বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। দেশপ্রেমের বীজ তাঁর তরুণপ্রাণে এমন প্রোথিত হয়েছিল যে, নাগপুরে ফিরেও ১৯১৫ থেকে ১৯২৫ এই দশ বছর জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় থাকেন। ১৯২১ সালে একবার গণআন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য তাঁর এক বছরের জেল হয়; আবার সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পরও ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তিনি দ্বিতীয়বার কারাবরণ করেন।

খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার পর, দল-রাজনীতির টানাপোড়েনের দোলাচলে ড. হেডগেওয়ার রাজনীতির বাইরে জাতি-নির্মাণে সংগঠনের প্রয়োজন অনুভব করেন। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি জাতীয়তাবোধের উন্মেষে দেশের তরুণ সমাজকে সংঘঠিত করার মানসে ১৯২৫ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। দেশ ও জাতি গঠনে, তরুণ সমাজকে তৈরি করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর Man-making Mission-এর জন্যে সর্বস্বত্যাগী তরুণদের আহ্বান করেন। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভগিনী নিবেদিতা ভারতবোধ জাগরণের জননীরূপে সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

অন্যদিকে ঠাকুর পরিবারের সরলা দেবী 'হিন্দু মেলায়' অনুপ্রাণিত হয়ে ছেলেদের অসিচালনা শিক্ষা, শরীরচর্চা তথা বীরাষ্টমী ব্রত পালনের প্রথা চালু করেন। বঙ্গভঙ্গের পর স্বদেশি আন্দোলনের কালে সংগ্রামী তরুণদের শরীরচর্চা, লাঠিখেলা, অস্ত্র চালনা শিক্ষার এক বিপুল ঢেউ ওঠে। কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষার সময় এসকলই নিশ্চয়ই ড. হেডগেওয়ারকে অনুপ্রাণিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথও বয়কট আন্দোলনের সময়, ব্রিটিশ বিরোধিতা অপেক্ষা শিক্ষায়, কর্মে স্বদেশ নির্মাণের ওপর জোর দিয়েছিলেন। সেসব দেখেই 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে বাংলা যেমন একদিন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, তেমনি ডাঃ হেডগেওয়ার স্বদেশ ও স্বজাতির পুনর্গঠনে একটি সঙ্ঘ গঠনের আবশ্যকতা অনুভব করেন। তাই ডাঃ হেডগেওয়ারের প্রাথমিক সঙ্কল্প ছিল রাজনীতি বর্জিত শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুশীলন সংস্থারূপে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা।

স্বামী বিবেকানন্দও রামকৃষ্ণ মিশনের গঠনমূলক কাজে যাতে কোনও ব্যাঘাত না লাগে সেজন্য সেটিকে রাজনীতি বর্জিত সংস্থারূপে ঘোষণা করেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতীকে রাজনীতিমুক্ত রেখেছিলেন। তাঁদেরই পথ অনুসরণ করে ডাঃ হেডগেওয়ারও রাজনীতিমুক্ত যে সঙ্ঘ ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল কিনা এই প্রশ্ন নেহাতই অবান্তর।

কিন্তু ডাঃ হেডগেওয়ারের পর, এম. এস. গোলওয়ালকর, স্বামী অখণ্ডানন্দের সাক্ষাৎশিষ্য, সুদূরপ্রসারী চিন্তায় ক্রমে সঙ্ঘটিকে একটি সেবা তথা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানরূপে সারা ভারতে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে কংগ্রেসেরও তৃণমূলস্তরে শাখা সংগঠন, কংগ্রেস দলের ভিত্তিভূমি রূপে কাজ করেছে। সেই সংগঠন ভেঙে দিয়ে ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেসের পায়ে কুঠারাঘাত করেছেন।

সর্বোপরি, সঙ্ঘের বিরুদ্ধে যে হেট পলিটিক্সের প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ, পরিহাসের বিষয়, বামপন্থী তথা বর্তমান গান্ধী কংগ্রেসের প্রধান অস্ত্রই হলো হেট পলিটিক্স। পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট ভেকধারীরা, তৎকালীন কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষ ও প্রফুল্ল সেনের নামে মিথ্যে অভিযোগেই ক্ষান্ত হয়নি, অপপ্রচারে প্রচারপত্র ছাপিয়ে অতুল্য ঘোষের আসানসোল নির্বাচন কেন্দ্রে ছড়িয়ে দিয়েছিল। পরে তা ডাহা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

গান্ধী কংগ্রেসের আজ মূল অস্ত্র বিজেপি তথা আর এস এসের বিরুদ্ধে হেট পলিটিক্স। সেখানে প্রণব মুখোপাধ্যায় নাগপুরে যে গণতান্ত্রিক সহনশীলতার কথা উচ্চারণ করেছেন তাতে কংগ্রেসের সুবুদ্ধির উদয় হলে ভালো। অন্তঃসারশূন্য মিথ্যা প্রচারে আশ্রয় না করে, গঠনমূলক রাজনীতিতে সমালোচনা ও উন্নয়নের তুলনামূলক আলোচনা দেশের পক্ষে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হতে পারে। ■

চিঠিপত্র

অকাল বোধনে থাকুক শ্রীরাম

আগামী ১৫ অক্টোবর থেকে শুরু হবে শারদীয়া দুর্গাপুজো। অকাল বোধন আশ্বিন মাসের পুজো। এই অকাল বোধন করেছিলেন শ্রীরাম রাবণ বধের জন্য। শারদীয়া পুজোয় মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার সঙ্গে থাকেন গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী, শিব। কিন্তু থাকেন না অকাল বোধনের মূল কর্তা পুরুষোত্তম শ্রীরাম। তাই শারদীয় পুজোতে শ্রীরাম থাকুন মূর্তি বা অন্য রূপে; দুর্গা পরিবারে। বিষয়টি পুরোহিত সমাজ, মৃৎশিল্পী ও বিজ্ঞজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—রাজকুমার জাজোদিয়া,
কালিয়াগঞ্জ, উত্তরদিনাজপুর।

প্রসঙ্গ : নাগপুরে প্রণববাবু

সঠিক কথাই লেখা হয়েছে 'গূঢ়পুরুষের কলম'-এ, (স্বস্তিকা ১৮ জুন ২০১৮) দেশজ কমিউনিস্টদের নগ্ন চেহারাটি ধরা পড়ে গেছে প্রণববাবুর নাগপুর সফর নিয়ে। ঠিকই, ভাবনা-চিন্তা-মতাদর্শের ক্ষেত্রে দেউলিয়া আজকের জাতীয় কংগ্রেসের একটাই অ্যাজেন্ডা, যাহোক তাহোক করে আর এস এসের বিরোধিতা— তাদের এই বোধটুকুও নেই যে রাষ্ট্রপতি পদটি প্রত্যক্ষ রাজনীতির ঊর্ধ্বে, ২০১২ সালের পর থেকেই ব্যক্তি প্রণব মুখোপাধ্যায় কংগ্রেসের বাইরের লোক। সাইড করে দেওয়া হলো চাণক্যকে, এমনধারা কথা সেই সময়ে উঠেছিল না? আজ আবার কোনও কোনও মহল থেকে বাতাসে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, প্রণববাবুকে নাকি সর্বসম্মত প্রধানমন্ত্রী করা হবে, কোনও দল যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ না হয়!

নির্বোধ তর্কে কাজ নেই, বরং বামপন্থীদের কাছে কংগ্রেস এখন রাজনীতির পাঠ নিচ্ছে, মানে ল্যাজ কীভাবে কুকুরের সম্পূর্ণ দেহটি দোলাচ্ছে— এই আলোচনা কৌতুকপ্রদ। ঠিক, বামেদের এ দেশে ভিটেমাটি চাটি, কেউই বামেদের হুঁকোয় তামাকু সেবন করতে চায় না। কিন্তু কমিউনিস্টদের আনুগত্য তো এ দেশের মাটির ওপর কখনও নয়! এই ব্যাপারে ইসলামধর্মের সঙ্গে তাদের ব্যাপক সাদৃশ্য। তাঁরা আন্তর্জাতিক। দোষ দিচ্ছি না। যে যার মতন, স্বধর্মে সৎ থাকলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এই যে একটা বিপুল হুক্কাহুয়া হচ্ছে প্রণববাবু নাগপুরে অতিথি হয়েছেন বলে, এতে কি বিপরীত দিকে আর এস এসের পক্ষেই একরকম পজিটিভ পৌরুষদৃপ্ত প্রচার ও প্রসার ঘটেছে না?

আর এস এস কোনও নিষিদ্ধ সংগঠন নয়—অথচ কোনও কোনও মিডিয়ার ঘেউ ঘেউ আমাদের অনেককেই কৌতূহলী করছে এই কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির উৎস কী, সে ইতিহাস বুঝতে। গান্ধীজীও নাগপুর গিয়েছেন, হেডগেওয়ার সাহেবের সুখ্যাতি করেছেন— এসব এখন জানা যাচ্ছে। এই সূত্রে আরও প্রকাশ পাচ্ছে, শুধু মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচন নয়, আর এস এস প্রতিষ্ঠার পেছনে ছিল আরও গভীর, সময়-অতিক্রমকারী দূরদর্শী ভাবনা, জাতিগঠন, চরিত্রগঠন, শৃঙ্খলা-চর্চা। জাতপাত, ধর্ম, রাজনৈতিক বিশ্বাসের বেড়া টপকে একধরনের মুক্ত সংস্কৃতি--- হেডগেওয়ার জানতেন, একমাত্রিক হিন্দুত্ব বলে কিছু হয় না, এই চিহ্নিত ভূমিখণ্ডে বসবাসকারী প্রত্যেকেই হিন্দু সংস্কৃতির অঙ্গীভূত।

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার তর্ক তো আলাদা, অনেক বড় ব্যাপার। গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের তর্ক তাতে পেড়ে ফেলা যায়। কিন্তু, আমাদের মিডিয়া বা সেকু মাকু বুদ্ধিজীবীরা এক জাতি এক প্রাণ ভাবনার মধ্যে 'এক শত্রু', সেও আবার 'মুসলমান', এমন ভাবনা কেন যে ছড়িয়ে দেন! জৈন-পারসিক-খ্রিস্টান-শিখদের চেয়ে তাঁরা সংখ্যায় অনেক বেশি বলে? কৃষ্টিগতভাবে, বাঙালিদের ক্ষেত্রে অন্তত হিন্দু ও মুসলমান এক। যাবতীয় ঝগড়াঝাঁটির উৎস, সম্পদ ও শিক্ষার অধিকার ইত্যাদি যা যা যে কোনও বৃহৎ পরিবারে ভ্রাতৃবিরোধের কারণ। এ বিরোধ সহজে বোঝা যায়, রাজনীতির লোকরা সুবিধা পেতে চান বলে ওটা জিইয়ে রাখেন। কিন্তু বাইরের যেসব শক্তি ভারতবর্ষকে ভাঙতে চাইছে, তাদের ব্যাপারে আন্তর্জাতিকতাবাদীরা আশ্চর্যভাবে নীরব। এই নীরবতা কেন?

১৯৩৫ সালে হেডগেওয়ারকে বলতে শুনি, ভারত এক উচ্চ আদর্শ, উচ্চ সংস্কৃতি, ভিন্ন ভাবনায় এগিয়ে থাকা দেশ— ত্যাগ তিতিক্ষা ও শৃঙ্খলাপরায়ণতাই যার সাধনপথ। ১৯৪০ সাল নাগাদ যখন দ্বিজাতিতত্ত্বের পালে জোর বাতাস বইছে, তখনও হেডগেওয়ার বলেন, মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদের উত্তরে সংগঠনের সভ্যরা রাজনীতিতে হিন্দু প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছেন। অথচ এর চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, হিন্দু সমাজকে জাগিয়ে তুলবে কে? কবে, কারা শুরু করবে সে কাজ? সারা দুনিয়া যখন সাম্প্রদায়িক সমীকরণ তথা অসুস্থ-অহং বিচারের জ্বরে ভুগছে, তখন কী সেই আধ্যাত্মিক- সাংস্কৃতিক চেতনা, যা এত বৈপরীত্যেও এই ভূমিকে ঘিরে থাকল?

প্রণববাবু তাঁর ভাষণে বলেছেন, ভারতের সভ্যতা পাঁচ হাজার বছরের পুরনো। এ আসলে প্রতীকী কথা, মোহন ভাগবতও যেমন তাঁর ভাষণে ভারতবর্ষের ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক ঐক্যের কথা বলেছেন। অধ্যাপকীয় তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়াঝাঁটিতে তো দেশ এগোয় না— রাজনীতি ও অর্থনীতির সঙ্গে সাধারণ মানুষকে জড়িয়ে তা করতে হয়। আর এস এস তো সে চেষ্টাই করছে!

কুতার্কিক কমিউনিস্ট ও নির্বোধ কংগ্রেসের কথা পেরিয়ে ফের গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ তর্ক মনে পড়ছে। গান্ধীজী বলেছিলেন, স্কুলে আগুন লাগলে, ছাত্ররা লেখাপড়া করবে কীভাবে? রবীন্দ্রনাথ তখন বলেছেন, আগুন নেভানোর জন্য উপযুক্ত জলাধার প্রস্তুত রাখতে হয়!

—রূপসনাতন রায়বর্মণ,
মধ্যপাড়া, রহড়া, কলকাতা।

প্রণববাবুর নাগপুর সফরে সংবাদমাধ্যমের গাত্রদাহ

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখুজ্জে মশায়ের নাগপুর সফর নিয়ে নানান মিডিয়ায় নানারকম প্রতিক্রিয়া বেশ কৌতুকপ্রদ চর্চার বিষয় হতে পারে। বাংলায়, বলাই বাহুল্য, সর্বাধিক বিক্রি

যে কাগজের, তার ইংরেজি সংস্করণের অ্যাটিচুডই সর্বাধিক বিকৃত, ইউ টু ব্রুটাসের মতন, ব্রুটাসের বদলে প্রণববাবু। অতি প্রাচীন ইংরেজ ঘেঁষা ইংরিজি দৈনিকের হেডিংয়ে warn শব্দটি ছিল, যেন প্রণব আর এস এস-কে সাধধান করে এসেছেন। সাধারণ জনতার পাঠ্য সহজ বাংলা দ্বিতীয় প্রধান দৈনিক যথাযথভাবেই সংবাদটি ছোট করে দেখিয়েছে, প্রথম পাতার অ্যাঙ্কর স্টোরি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-সহ জাতীয় দৈনিক যে কটি চোখে পড়ল, মোটমুটিভাবে যা যা হয়েছে তাই বিবৃত করতে চেয়েছে।

কথা হলো, বিবৃতিকে বিকৃত করার প্রয়াস আসে কোথা থেকে? এমন তো নয় যে এই প্রথম কোনও 'বহিরাগত'কে আমন্ত্রণ জানানো হলো শিক্ষাবর্গের সমারোপ অনুষ্ঠানে! প্রণববাবু প্রথাসিদ্ধ প্রবণতাতেই বলেছেন, বহুত্ববাদ ও সহিষ্ণুতাই ভারতের আত্মা, বহু শতাব্দী ধরে যে ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। দ্বাদশ শতাব্দী অবধি রাজত্ব করেছে নানান বংশ, তারপর এল মোগল সাম্রাজ্য। হেডগেওয়ার সাহেবকে প্রশংসা করার পাশাপাশি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কথাও বলেছেন আধুনিক ভারতের রূপকার হিসেবে। আর এস এসের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতও প্রায় এই কথাগুলো বলেছেন আরও প্রসারিত ভঙ্গিতে। অথচ, প্রধান মিডিয়াগুলো লিখল, প্রণববাবু সঙ্ঘকে সহনশীলতার দর্পণ দেখিয়ে এলেন। 'আপনার মুখ আপুনি দেখ' গোছের কাণ্ড? হ্যাঁ, হিংসা ও ক্রোধের দ্বারা মহৎ কার্য সম্পাদন হয় না, এতো সত্যিই। কিন্তু মোগলদের সাম্রাজ্যবাদী তথা আগ্রাসনকারী বলেই যেন প্রণব মহা পাপ করে ফেললেন সেকু- বাদীদের কাছে। সোশ্যাল মিডিয়া তৎপর ছিল আলটপকা শব্দ খুঁজে মন্তব্য ছুঁড়ে দিতে। বহুত্ববাদ আমাদের সংবিধান নিহিত জাতীয়তায়, দেশপ্রেমে— ব্যস, এর ব্যাখ্যা দেওয়া হলো, জাতীয়তাবাদ যেন সংবিধান ভিত্তি করেই সৃষ্টি হলো! হাজার বছরের প্রাচীন জাতীয়তার কথা তুললে দক্ষিণপন্থার দুর্গন্ধ পাওয়া যাবে যে! বামপন্থীদের বুদ্ধিতে চলা কংগ্রেসিরা কি সেসব বলতে পারে?

দিনে দিনে, সাধারণ মানুষের কৌতূহলেই আর এস এসের জনভিত্তি বাড়ছে। বনবাসী কল্যাণ আশ্রম ও বিদ্যাভারতীর মাধ্যমে উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে বড় বড় শহরে শিক্ষাবিস্তার, সামাজিক কল্যাণে তার কাজকর্ম আরও বেশি করে অনেকের চোখে পড়ছে বলেই বোধহয় মিডিয়ার এত ঘেউ ঘেউ, ভেউ ভেউ! একথা খুব ঠিক, ওইসব স্কুল কিংবা সঙ্ঘের সামাজিক শাখাপ্রশাখা বিস্তার বৃদ্ধি পেয়েছিল গত শতাব্দীর ৫০-এর দশকে। ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর সভ্যসংখ্যা বেশ বাড়ে, যে প্রবণতা ফের দেখা যায় ১৯৭০-এর পরে। অর্থাৎ, যখনই দেশ বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত, তখনই যেন শেকড়ের দিকে বেশি করে দৃষ্টি যায়। হিংসা কিংবা অসহিষ্ণুতা তাহলে ঠিক কোথা থেকে শুরু? ফ্যাসিস্ট, তথা ফ্যাসিজম শব্দটা আলটপকা এবং নির্বোধভাবে ব্যবহৃত হয় এ দেশের মিডিয়ায়। দুইটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ইউরোপে ধনতন্ত্রের যে সঙ্কট, গণতন্ত্রের যে বিপন্নতা, তা কি এ যাবৎ বিশ্বে আর কোথাও দেখা গেছে? শত সমস্যা সয়েও আমাদের দেশের গড় আর্থিক বার্ষিক বৃদ্ধি ৭ শতাংশের কাছাকাছি। রাজ্যে রাজ্যে নানান রঙের সরকারের রাজত্ব এবং যা খুশি তাই বলার বদমায়েশি বা বোকামি, বৃহৎ বাণিজ্যপুষ্ট খবরের কাগজ অথবা স্থানীয়ভাবে ছোটোখাট মিডিয়ারও আছে। যতটুকু খুশি আমরা তা গ্রহণ করতে পারি, নিজেদের মতন ব্যাখ্যাও দিতে পারি। ১৯৪৯ সালে যে জয়প্রকাশ নারায়ণ গান্ধী-হত্যাকারী বলে চিহ্নিত আর এস এস কে নিষিদ্ধ রাখার দাবিতে অনড়, প্রায় তিন দশক বাদে সেই জয়প্রকাশই আর এস এস-কে আহ্বান করেন ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচারী প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়তে। রাজনীতিতে এমন হয়। কিন্তু অদ্ভুত আমাদের মিডিয়ার প্রবণতা— নানান বিদেশি শক্তি—হুরিয়ত, ভারতের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দেওয়াই যাদের নিত্যকাজ, তাদের নিয়ে আলোচনা তথা আলোচনার আলোচনা চলতেই থাকে, কিন্তু আর এস এস স্বাদেশিকতায় দীক্ষিত বলেই যেন ব্রাত্য! প্রণবাবুর নাগপুর যাত্রা, তবু তো নানারকম কথাবার্তা শোনা ও বলার অবকাশ এনে দিল! এই প্রবণতা গঠনমূলকভাবে বজায় থাকুক।

—টুটুল ভরদ্বাজ,
ঝিল রোড, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৩১।

প্রণবের সফর নিয়ে গুঞ্জন চলবেই

৭ জুন ২০১৮-র প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি নাগপুরে সঙ্ঘের অনুষ্ঠানে যে ভাষণটি পাঠ করলেন তা 'বহুত্ববাদের সবক' শিখানো গোছের। 'বহুত্ববাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা' এই দুটি শব্দের সহনশীলতার প্রশ্ন এসে যায়। সকল ধর্মের মধ্যে হিন্দুধর্মে ধর্মীয় পদ্ধতির মধ্যে সর্বাধিক সহনশীল তথা গ্রহণশীলতার পরিচয় দিয়ে এসেছে এর অভ্যন্তরীণ তত্ত্ব ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের মনোভাবের মতো তীব্র অসহিষ্ণু স্বাতন্ত্র্যশীল নয়। সাম্প্রতিককালে ভারতের দিল্লি ও গোয়ার গির্জা প্রধানের 'ধর্মনিরপেক্ষ' বক্তব্য গোটা ভারতের বিদগ্ধমহলে সমালোচিত হচ্ছে। নাগপুরে সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষ শিক্ষাবর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির নিকট সঙ্ঘ অনুরাগীরা নতুন কিছুর শোনার অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু শতবর্ষের এক প্রাচীন দলের একটা ভ্রান্ত ধারণা 'বহুত্ববাদের সবক'নেতা প্রণব মুখার্জির নিকট হতে পেয়ে সন্তুষ্ট হতে হলো। সঙ্ঘ বহুত্ববাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী নয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী তথা হিন্দুত্ববিরোধী কংগ্রেসের একজন সদস্য তা বিশ্বাস করেন বলে মনে হয় না। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তথা কংগ্রেস নেতা প্রণব মুখার্জি এই অন্ধধারণার মুক্তচিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়ে দু'হাত তুলে সঙ্ঘের 'হিন্দুত্ববাদের' দরাজ সার্টিফিকেট দিয়ে যাবেন সঙ্ঘের অতি বড় অনুরাগী আশা করেন না। জাতীয়তার প্রশ্নে ভারতীয় ভাবনার হিন্দুদৃষ্টিভঙ্গি থাকা স্বাভাবিক। কংগ্রেস জন্মলগ্ন থেকে এ ধারণার বিরোধী। স্বাধীনত্তোর ভারতে প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের জটিল সমস্যার সম্মুখীন। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি অতি সুকৌশলে এই সমস্যা এড়িয়ে গেছেন। সঙ্ঘের ভিজিটর বুকে 'ভারতমাতার মহান সন্তানকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি' এই লেখা বহুদিন গুঞ্জন চলবে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির দলের অভ্যন্তরে। সঙ্ঘ এবং সঙ্ঘঅনুরাগীদের এটাই বড় প্রাপ্তি।

—বিরূপেশ দাস,
বর্ধমান।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

মেয়েদের নেতিবাচক ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে

সুস্মিতা রায়

গত কয়েক দশকে বিশ্বের প্রভূত উন্নতি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এর ফলে বিভিন্ন পার্থিব পরিবর্তন মানুষকে ভালো ও মন্দ উভয় দিকে পরিচালিত করছে। পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত ও বুদ্ধিমান প্রাণী হওয়ার কারণে মানুষ এই পরিবর্তন উপলব্ধি করতে সক্ষম। ভালোর দিকে অগ্রসর হওয়া মনুষ্যজাতির পক্ষে স্বাভাবিক। বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়িয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আধুনিকতা ও সভ্যতার ভুল ব্যাখ্যা করে কিছু মানুষ পিছনের দিকে হেঁটে চলেছে। অতি আধুনিকতার দোহাই দিয়ে তারা মানবিক মূল্যবোধগুলি নষ্ট করে চলেছে। ইতিবাচক ভাবনার বদলে নেতিবাচক ভাবনাকেই তারা সঠিক বলে মনে করছে। সেভাবেই তারা বিশ্বকে দেখতে চাইছে। এই অতি আধুনিকতা বা নেতিবাচক ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ট্রেনে, বাসে, রাস্তায় আকছার চোখে পড়ছে।

এই নেতিবাচক ভাবনা থেকেই পাশ্চাত্যে জন্ম হয়েছে নারীবাদী আন্দোলন। এর মূলকথা হলো, পুরুষরা যা যা করতে পারে মেয়েরা তা করতে পারবে না কেন? গরম লাগলে বা স্নানের সময় পুরুষরা খালি গায়ে থাকতে পারলে, মেয়েরা পারবে না কেন? সেই অধিকার অর্জনের জন্য পাশ্চাত্যের কোনও কোনও দেশে দাবি উঠল। কোথাও কোথাও সেই দাবি মেনেও নেওয়া হলো। কিন্তু অচিরেই তার কুফল প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্ববাসী। ভারতে ন্যুডিটি মুভমেন্টের হাওয়া না লাগলেও কিছু তরুণী বিশেষভাবে ছেঁড়া জিনস্ পরে নারী-স্বাধীনতা ভোগ করছে।

নেতিবাচক ভাবনার আরও একটি স্লোগান হলো মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতা চাই। আজ তো মেয়েরা চার দেওয়ালের মধ্যে

বন্দি নেই। যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন পেশায় আজ মেয়েদের অবাধ বিচরণ। পুরুষের সঙ্গে সমান তালে তারা এগিয়ে চলেছে। এরজন্য সমাজ বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ভাবনার দৈন্য দেখা যায় যখন বলা হয়, নিজের পরিবারের মধ্যে মেয়েরা প্রচুর পরিশ্রম করেন তার জন্য তারা কোনও পারিশ্রমিক পান না। মনে ভয় হয়, এক একটি সুখের সংসার ভেঙে দেওয়ার এ কোনও চক্রান্ত নয় তো?

নেতিবাচক ভাবনার আর একটি জ্বলন্ত উদাহরণ কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়া মেয়েদের প্রকাশ্যে ধূমপান। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীরা বেশি ধূমপানাসক্ত। তাদের প্রশ্ন, ছেলেরা প্রকাশ্যে ধূমপান করলে মেয়েদের বেলা আপত্তি কেন? ভাবতে অবাক লাগে, একটা খারাপ নেশায় ছেলেরা আসক্ত হয়ে পড়েছে, তাই বলে ছেলেদের সমান হওয়ার জন্য মেয়েদেরও সেই নেশায় আসক্ত হতে হবে? এটা কি সুস্থ প্রতিযোগিতা?

আসলে সিগারেট কোম্পানিগুলি শুধু পুরুষদের সিগারেট সেবনে খুশি নয়, তাই তারা বিক্রি বৃদ্ধির জন্য মেয়েদের বিশেষ করে ভারতের মেয়েদের দিকে দৃষ্টি দেয়। আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তারা বাজার তৈরি করে। তারা খুব খুশি যে, ভারতের মেয়েরা তাদের বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পা দিয়েছে। শুধু সিগারেট নয়, অন্যান্য আজেবাজে নেশায় শিক্ষিতা মেয়েরা আসক্ত হয়ে পড়েছে।

আমরা সকলেই একমত যে, ছেলে ও মেয়েদের সমান সুযোগ থাকা উচিত। বাস, ট্রেন থেকে চাকরি— সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা রিজার্ভেশনের নামে সুবিধা নিয়েছি। এতে আমাদের অর্জন করার মনোবল কি কমে যাচ্ছে না? মেয়েরা কি এতই দুর্বল যে, বাসে ট্রেনে বসার জায়গা পাওয়ার জন্য 'মহিলা' স্টিকার লাগিয়ে রাখতে হবে? মুশকিল হলো আমরা মেয়েরা যতই নারী স্বাধীনতার বড়াই করি না কেন, এখনও নিজেদের 'মেয়ে' ভাবতেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করি। ভেবে দেখি না, এই লিঙ্গনির্ভরতা লিঙ্গবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের অন্তরায়। সেই সঙ্গে এই সুবিধাবাদী মনোভাবকে দ্বিচারিতাও বলা চলে।

ভারতের মেয়েরা অতীতের মতো বর্তমানেও শ্রেষ্ঠত্বের শিখর স্পর্শ করেছে এবং বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, তারা পুরুষের তুলনায় কম নয়। নেতিবাচক ভাবনা অধিকারকে প্রাধান্য দেয়। শুধু অধিকার সম্পর্কে সচেতন না থেকে কর্তব্যের প্রতিও দায়িত্বশীল হতে হবে। এজন্য সমস্ত রকম নেতিবাচক ভাবনাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলতে হবে। ▌

ক্যানসার থেকে দূরে থাকতে যেসব খাদ্য বর্জন করা উচিত

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

মানবদেহে একশোর বেশি রকমের ক্যানসার হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। ঠিক কী কারণে ক্যানসার হয় তা এখনও নিশ্চিত করে বলা না গেলেও সাধারণ কিছু কারণ খুঁজে পেয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। সেইজন্য তাঁরা বিভিন্ন রকমের খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

মাইক্রোওয়েভ পপকর্ন ঃ ভুট্টার তৈরি খই বা পপকর্ন যে কখনও মারণব্যাধি ক্যানসারের কারণ হতে পারে তা কোনও দিন হয়তো কেউ কল্পনা করতে পারেনি। কিন্তু সত্য হলো, এই পপকর্ন স্বাস্থ্যের জন্য বেশ বিপজ্জনক হতে পারে। প্রথমে বলা যেতে পারে পপকর্ন রাখা ব্যাগের কথা। এই ব্যাগে থাকা বিষাক্ত পারফ্লোরো অক্টায়নিক অ্যাসিড মানবদেহে জন্য ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।

নন অর্গানিক ফল ঃ বিভিন্ন ধরনের নন অর্গানিক ফলফলাদিতে বিশেষ করে অ্যার্টাজিন, থায়োডিকার্ব এবং অর্গানাপসফেটসে উচ্চ নাইট্রোজেন থাকে। কীটনাশক বা রাসায়নিক সার হিসেবে ব্যবহৃত ইউরিয়াও খাবারে ব্যবহার করা হয়। এগুলো ক্যানসারের কারণ।

রেডিমেড খাবার ঃ বাস্তবিক অর্থে বেশিরভাগ প্যাকেটজাত খাদ্য স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। এসব খাদ্য বিশনেপল এ বা বিপিএ দিয়ে প্রস্তুত করা হয়। রেডিমেড টমেটো টিনজাত টমেটোও এর আওতায় রয়েছে। ২০১৩ সালে জাতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির এক গবেষণায় জানা যায়, বিপিএ শরীরে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে, ব্রেনেও যার প্রভাব পড়ে। অধিক অম্ল টমেটো খুব বিপজ্জনক।

প্রক্রিয়াজাত মাংস ঃ মাংস প্রক্রিয়াকরণে বা দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করতে বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত পদার্থ মেশানো হয়ে থাকে। এর মধ্যে হট ডগ, বেকন-সহ বিভিন্ন ধরনের মাংসের প্যাকেট রয়েছে। এসব খাদ্য ক্যানসারের মতো রোগের সৃষ্টি করে।

চাষ করা স্যালমন ঃ মাছ স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী। কিন্তু এই মাছটি ত্যাগ করা উচিত। চাষের সময় এই মাছে কৃত্রিম খাদ্য ও রাসায়নিক সার, কীটনাশক দেওয়া হয়।

পটেটো চিপস ঃ পটেটো চিপস খুবই রুচিকর খাদ্য হলেও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

অতিরিক্ত লবণ ও স্মোকিং ফুড ঃ খাদ্য সংরক্ষণে নাইট্রেড বা নাইট্রেস ব্যবহার করা হয় তা থেকে এবং ধূমপান ও নন-নাইট্রেসো সমৃদ্ধ খাবারের কেমিক্যাল ক্যানসারে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। পুড়িয়ে অথবা ভেজে তৈরি করা খাবার কিংবা বাদাম স্মোকিং ফুড হিসেবে পরিচিত। মাংসের তৈরি অনেক খাবারে প্রচুর চর্বি ও লবণ থাকে। আচারেও বেশি পরিমাণে লবণ থাকে। এসব খাবার কোলেস্টেরল ক্যানসার এবং পেটের ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়।

প্রক্রিয়াজাত আটা ঃ আটা শর্করা জাতীয় খাবার যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। কিন্তু প্রক্রিয়াজাত সাদা আটা খুবই ক্ষতিকর। রিফাইনের ফলে এই আটা তার পুষ্টিগুণ হারিয়ে ফেলে। আটার মিলগুলো আটা সংরক্ষণের জন্য ক্লোরাইন গ্যাস নামে একপ্রকার কেমিক্যাল ব্যবহার করে যা খবই ক্ষতিকর।

পরিশোধিত চিনি ঃ পরিশোধিত চিনির ঝুঁকি বিস্তর। এই চিনি স্থূলতার জন্য দায়ী। পরিশোধিত চিনি নানা ধরনের স্বাস্থ্যগত সমস্যা ছাড়াও ক্যানসার সেলের জন্ম দিচ্ছে।

কৃত্রিম চিনি ঃ ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগী চিনির বিকল্প হিসেবে আর্টিফিসিয়াল সুইটেনার্স বা কৃত্রিম চিনি খান। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কৃত্রিম চিনি তৈরিতে ব্যবহৃত হয় সোডা ও কফি সুইটেনার্স। এতে ডায়াবেটিস বৃদ্ধি-সহ ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

অ্যালকোহল ঃ অতিমাত্রায় মদ্যপানের কারণে ক্যানসারের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

রেডমিট ঃ লাল মাংস স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। প্রাণঘাতী ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। গবেষণায় জানা গিয়েছে, লাল মাংসে এন নিট্রোসোডিয়েথিলামিন নামে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ থাকে। এর মাত্র ০.০০০০৭৫ শতাংশ গ্রামই শরীরে ক্যানসার সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট। লাল মাংসে থাকা উচ্চমাত্রার ক্ষতিকর কোলেস্টেরল অন্ত্র ও পাকস্থলীর ক্যানসার সংক্রমণে কাজ করে।

(লেখক হোমিওপ্যাথিক ক্যানসার বিশেষজ্ঞ)

মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের রূপ

উজ্জ্বলকুমার মণ্ডল

মহাপ্রভু রত্নবেদির উপর বসে আছেন। রাজাধিরাজ তিনি। সঙ্গে দাদা, বোন আর অস্ত্র সুদর্শন। কিন্তু এ কী রূপ তাঁর! 'কৃষ্ণের যতেক খেলা/ সর্বোত্তম নব নরলীলা/ নরবপু তাঁহার স্বরূপ।' তিনি কৃষ্ণ ভগবান। ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন বল্লভায় স্বাহা। 'কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপীজন-বল্লভ' বলতে আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে 'চরণে চরণ রাখি অধরে মুরলী' মূর্তি। কোথায় মুরলী, কোথায় চরণ। প্রভুর চরণ নেই। দুটি হাত আছে। বড়সড় হাত, মহাবাহু। সামনের দিকে প্রসারিত। সে হাতে আঙুল নেই। কোমর অবধি শরীর। শরীরের কোনও কাঠামোই নেই। কান নেই। মাথায় চুল নেই। কাঁধ বলেও কিছু নেই। শুধু মাথা আর ধড়। নাক আছে, কিন্তু কেমন যেন ভোঁতা। গায়ের রং কালো। প্রভুর থাকার মধ্যে আছে দুটি চোখ। পদ্মপলাশলোচন নয়, পদ্মপাতার মতো গোল, বৃহৎ। প্রভুর ওড়িয়া ভক্তগণ ভালোবেসে বলেন— 'চকা নয়ন'। সে নয়নে পলক পড়ে না, সদা জাগ্রত আর বিস্ফারিত। সে নয়নে নয়ন পড়লে প্রভুর কী আছে, আর কী নেই সে হিসাব কে করে!

দাদা বলরামেরও প্রায় একই অঙ্গসৌষ্ঠব। গায়ের বর্ণটি সাদা। মধ্যস্থ ভগিনী সুভদ্রার আবার হাতও অদৃশ্য। তাঁর বর্ণ হলুদ।

এখন প্রশ্ন জাগে, মহাপ্রভুর এই অসম্পূর্ণ অঙ্গের কারণ কী? সঙ্গত প্রশ্ন। যিনি জগতের নাথ তাঁর কেন এমন অঙ্গ বিকল হলো? পুরাণ বলে, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে সমুদ্র থেকে যে দারুব্রহ্ম উদ্ধার করেন, তা থেকে মূর্তি বানাবার জন্য অনন্ত মহারানা নামে এক শিল্পী হাজির হয়েছিলেন। এই শিল্পী আর কেউ নন, তিনি বিশ্বশিল্পী বিশ্বকর্মা স্বয়ং ভগবান। ভগবান অশক্ত বৃদ্ধের রূপ ধরে মূর্তি বানিয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেন, একটি শর্তও রাখলেন— একুশ দিন ধরে একটি রুদ্ধদ্বার গৃহে তিনি মূর্তি নির্মাণ করবেন। কিন্তু এর মধ্যে কোনওভাবে দ্বার খোলা যাবে না।

দুই সপ্তাহ কেটে যাওয়ার পর ভেতর থেকে সূত্রধরের ঠুকঠাকের কোনও শব্দ না পেয়ে রাজা চিন্তায় পড়লেন, রানিও তদরূপ। দুজনে শলাপরামর্শ করছেন কিং কর্তব্য। শেষে সাব্যস্ত হলো দরজা খোলা যাক। মন্ত্রী বাধা দিলেন, তাতে কাজ হলো না। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন শিল্পী অন্তর্হিত। গৃহমধ্যে বিরাজ করছেন তিন বিগ্রহ। কাছে গিয়ে দেখলেন— তিন বিগ্রহই অসম্পূর্ণ। বিগ্রহ দেখে নিজের হঠকারিতার জন্য রাজা শোকমগ্ন হলেন। এই শিল্পী অন্য কেউ নন। তিনি ভগবান। রাজা প্রতিশ্রুতি পালন করেননি, তাই মূর্তিত্রয়ের এই অপূর্ণ বিকলাঙ্গ অবস্থা। শোকমগ্ন রাজা চরম আত্মগ্লানির জন্য কুশশয্যায় শয়ন করে আত্মাহুতি দেবার সংকল্প গ্রহণ করেন। কিন্তু দয়াময় ভগবান তাঁকে নিরস্ত করে জানালেন— তিনি এই রূপেই ভক্তের নৈবেদ্য গ্রহণ করবেন। এই হলো, মহাপ্রভুর অদ্ভুত রূপের পুরাণ-প্রোক্ত বিবরণের স্থূল অয়নরেখা।

কিন্তু মানুষ মানবে কেন? মানুষ প্রভুর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষকে তিনি বুদ্ধি দিয়েছেন, মেধা দিয়েছেন আর দিয়েছেন অবিশ্বাস, সংশয়। সে তর্ক তুলবে, প্রশ্ন করবে, রচিত হবে থিসিস। সেই থিসিসের আবার অ্যান্টিথিসিসও হবে। শ্রীমন্দির থেকে প্রভুকে যেতে হবে তীক্ষ্ণবুদ্ধি গবেষকের গবেষণাগারে। সেরকম এক গবেষণা বলছে, ভাই-বোন ওসব কিছু নয়, হিন্দু জাতির চারটি বর্ণ মূর্ত হয়েছে চতুর্ধা মূর্তিতে। বলভদ্রের রং সাদা, তিনি ব্রাহ্মণ। মধ্যস্থ সুভদ্রা হলুদ, তিনি বৈশ্য। জগন্নাথ কৃষ্ণবর্ণ তিনি শূদ্রের প্রতিনিধি। বাদ থাকল সুদর্শন যার রং লাল, এ হলো ক্ষত্রিয়। চার বর্ণের প্রতীক চারটি বর্ণ একই বেদিতে সমাসীন হওয়ার ফলে বর্ণভেদ নয়, বরং চারটি বর্ণের মধ্যে সমতা রক্ষিত হচ্ছে।

জগন্নাথ প্রথমে এক নিবিড় জঙ্গলে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁকে পূজা করতেন বিশ্বাবসু নামে এক শবর। জঙ্গলের ফলমূল, কন্দই ছিল প্রভুর নৈবেদ্য। সবটাই ঘটত লোকচক্ষুর আড়ালে। তখন অবশ্য তিনি জগন্নাথ নামে জগদ্‌পূজ্য নন, নীলমাধব নামেই শবরের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিলেন। রাজপুরোহিত বিদ্যাপতি নীলমাধবের সন্ধানে নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে শবরপল্লীতে উপস্থিত হন। তিনি বিশ্বাবসুর গৃহে অবস্থান করেন। শবরকন্যা পূর্ণযুবতী ললিতার প্রণয়-পাশে বদ্ধ হন, বিয়েও হয়। গবেষকদের কাছে নীলমাধব শব্দটি ভারি রহস্যময়। বিশ্লেষণ করলে তিনটি দল পাওয়া যায়— নীল, মা ও ধব। নীল হলেন জগন্নাথ। তাঁর গায়ের রং নীল বা কালো, যাতে অসীমের শূন্য আভাস। 'মা' সুভদ্রা, যিনি ঐশ্বর্যের প্রতীক, তিনি দেবী লক্ষ্মী। ধব মানে সাদা। সাদা বলরামের গায়ের রং। তিনি শৌর্যের প্রতিভূ। এই হচ্ছে নীলমাধবের তাৎপর্য।

একটা প্রশ্ন থেকে যায়, বিশ্বাবসু যখন নীলমাধবের পূজা করতেন, তখন নীলমাধব একক বিগ্রহই ছিলেন। সুভদ্রা আর বলরাম অনুপস্থিত। তা হলে, একের মধ্যে তিনের ভাবনা এটা শুধু কল্পনা ছাড়া আর কী?

মহাযানপন্থী বৌদ্ধদের বিশ্বাস, জগন্নাথ আসলে বুদ্ধই। তিন মূর্তির মধ্যে ধর্ম, সঙ্ঘ ও বুদ্ধ— এই তিন তত্ত্ব প্রকাশিত। আর এই তিনের সঙ্গে যে সুদর্শন আছে তা ধর্মচক্র রূপে বিচার্য। আর শুধু বৌদ্ধরাই নন, বিদেশি পণ্ডিতদের কেউ কেউ মনে করেন, জগন্নাথ আদতে বৌদ্ধ ত্রিরত্নই। বলরাম, সুভদ্রা আর জগন্নাথ বৌদ্ধ ত্রিরত্নেরই পরিবর্তিত রূপ, বিকারপ্রাপ্তও বটে। বিদেশি মনীষী এ ক্যানিংহাম যুক্তি সাজিয়েছেন এভাবে—

১। সাঁচীর ত্রিরত্ন ভাস্কর্য থেকে বলা যায় যে, জগন্নাথ মূর্তি প্রাচীন বৌদ্ধত্রয়ীর অনুরূপ। ২। ফা-হিয়েন বর্ণিত বুদ্ধমূর্তির শোভাযাত্রার সঙ্গে জগন্নাথের রথযাত্রার মিল বর্তমান। ৩। রথযাত্রায় জাতপাতের বালাই নেই, কারণ বৌদ্ধধর্মে জাতবিচারের স্থান নেই। ৪। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, মূর্তিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র অস্থি রক্ষিত আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মে কোনও দেবমূর্তির মধ্যে অস্থি রাখা অশাস্ত্রীয়। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে এরূপ স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণের প্রচলন আছে।

বিদেশি পণ্ডিতদের এসব সিদ্ধান্ত অনেক দেশি পণ্ডিত যেমন সমর্থন করেছেন, তেমনি অনেকে আবার তা খণ্ডনও করেছেন। তাঁদের যুক্তি, সাঁচীর ত্রিরত্ন মূর্তির সঙ্গে জগন্নাথ মন্দিরের ত্রিমূর্তির বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নেই। দ্বিতীয়ত, জগন্নাথের রথযাত্রার সঙ্গে বুদ্ধমূর্তির শোভাযাত্রার সাদৃশ্য— এ শুধু ফা-হিয়েনের কষ্টকল্পনা। বুদ্ধের আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকে রথযাত্রা হিন্দুধর্মে স্বীকৃত। অথর্ববেদে (২০।১৪।৪) সমস্ত দেবতাকে একটি রথে বা ভিন্ন ভিন্ন রথে আনার জন্য অগ্নিদেবের নির্দেশের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া, ঋক্‌বেদেই সূর্যদেবের সপ্তাশ্ববাহিত রথের কথা রয়েছে। কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় বল্লীর তৃতীয়মন্ত্রে লিখিত হয়েছে :

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।।

এখানে রথ, সারথি প্রভৃতি শব্দ রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তবু রথের অস্তিত্ব এসব শব্দ, উপমা প্রমাণ করে। এ বিষয়ে পুরাতত্ত্ববিদ নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : ''রথযাত্রা প্রথা বহু প্রাচীন, জগন্নাথ ব্যতীত অপরাপর হিন্দু দেবদেবীরও রথযাত্রার বিবরণ পাওয়া যায়। তাছাড়া বুদ্ধের পূর্বকালিক প্রসিদ্ধ জৈন তীর্থঙ্কর ও মহাবীর স্বামীর রথযাত্রার প্রমাণ দ্বারা বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব হইতেই যে রথযাত্রা প্রচলিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না।''

তৃতীয়ত, জাতবিচারের প্রসঙ্গে ক্যানিংহামের বক্তব্যও মেনে নেওয়া যায় না। বুদ্ধমূর্তি বলেই জগন্নাথ মন্দিরে রথযাত্রা ও অন্যান্য উৎসবের সময়ে জাত বিচার করা যায় না। যদি তাই হতো, তাহলে কেবল উৎসবের সময়টুকুই বা কেন, সেখানে কোনওদিনই জাতপাতের প্রশ্ন আসত না।

বাকি থাকল বুদ্ধের দাঁত তথা জগন্নাথের ব্রহ্মমণি। তথ্য হলো, বুদ্ধদেবের দাঁতটি কুশীনগর থেকে প্রথমে কলিঙ্গে আসে, সেখান থেকে সিংহলে প্রেরিত হয়। এখনও সেখানকার অনুরাধাপুরে পূজিত হচ্ছে। কাজেই বুদ্ধের দাঁতের সঙ্গে জগন্নাথের যোগ অসত্য ও ভিত্তিহীন।

দেশি পণ্ডিতরা যখন বিদেশি পণ্ডিতদের জগন্নাথের উপরে বুদ্ধের আরোপ মেনে নিয়েছেন, তখন ফরাসি পণ্ডিত জি দঁ আলভিয়েল ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন : ''তিব্বতে ঠিক এই ধরনের তিন পরমেশ্বরের মূর্তি চোখে পড়েনি যার সঙ্গে ধর্ম, সঙ্ঘ এবং বুদ্ধকে সংসৃষ্টি করা যায়। যদিও অনেকে বলে থাকেন যে, ভারতবর্ষে এই ধরনের বুদ্ধত্রিমূর্তি আছে। আমি কিন্তু বুদ্ধমূর্তিগুলি লক্ষ্য করে এরকম কোনও প্রমাণ পাইনি।''

অনেকে মনে করেন, জগন্নাথকে শ্রীকৃষ্ণভাবে ভাবিত করেছেন কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের অনেক আগে শ্রীক্ষেত্রে এসেছিলেন আদি শঙ্করাচার্য। তিনি দেখলেন, মন্দিরে বিগ্রহ নেই, বেদিতে শালগ্রাম শিলা আছেন, বিগ্রহ অভাবে তাঁরই পূজা হচ্ছে। তিনি জানলেন, বৌদ্ধদের অত্যাচারের হাত থেকে বিগ্রহকে রক্ষা করার জন্য অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এবং সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে জগন্নাথকে কোথায় যে রাখা হয়েছে তা তারা ভুলে গেছে। আচার্য শঙ্কর জানতে চাইলেন— তিনি যদি জগন্নাথের সন্ধান দিতে পারেন তাহলে কি তারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে? উপস্থিত পাণ্ডা, পূজারি, শৃঙ্গারি সকলে বলেছিলেন— জগন্নাথকে পেলে তাঁরা ধন্য হবেন।

এরপর আচার্য শঙ্কর ধ্যানে বসলেন। ধ্যান থেকে উঠে শঙ্কর জানালেন— জগন্নাথের ব্রহ্ম সংবলিত রত্নপেটিকা চিলকা হ্রদের পূর্ব তীরে একটি পুরনো বটগাছের নীচে রক্ষিত আছে। এরপর সকলে সোৎসাহে আচার্য-নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে রত্নপেটিকা উদ্ধার করলেন এবং আচার্যদেবের নির্দেশমতো জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হলো। আচার্য শঙ্কর এই সময় জগন্নাথের উদ্দেশে আটটি স্তব রচনা করেছিলেন। কৃষ্ণ অনুধ্যানেই এই স্তবমালা রচিত হয়েছিল। শুধু কৃষ্ণ কেন, রাধারানির প্রসঙ্গও এসেছে :

পরো বর্হাপীড়ঃ কুবলয়দলোৎফুল্লনয়নো
নিবাসো নীলাদ্রৌ নিহিতচরনোহনন্ত শিরসি।
রসানন্দো রাধাসরসবপুরালিঙ্গন সুখো।

যাঁর পরনে পীতবসন, যাঁর কুবলয়দলোৎফুল্ল নয়ন, অনন্তের শিরে যিনি চরণ রেখেছেন, রাধার প্রেমপূর্ণ দেহ আলিঙ্গন করে যিনি সুখলাভ করেন— সেই জগন্নাথঃ স্বামী নয়ন-পথ-গামী ভবতু মে। ▮

মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের রথযাত্রা

জলজ বন্দ্যোপাধ্যায়

ওড়িশার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে পুরী জেলার সমুদ্রতীরে হিন্দুদের পুণ্যতীর্থ পুরী নামের জায়গাটি নীলাচল, শ্রীক্ষেত্র বা পুরুষোত্তম নামে পরিচিত। এখানেই আছে ভারতখ্যাত জগন্নাথদেবের বিরাট মন্দির। ওড়িয়া ভাষায় ক্ষেত্রপুরাণ, মাদলাপঞ্জী, বাংলায় রচিত পুরুষোত্তমচন্দ্রিকা আর জগন্নাথমঙ্গল এবং বিভিন্ন পুরাণ ও সংস্কৃত গ্রন্থে জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য বা কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে।

কোনও কোনও দেশি-বিদেশি ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ মনে করেন, ওড়িশার এই জগন্নাথধাম এক সময়ে বৌদ্ধক্ষেত্র ছিল। সাত শতকে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ভারতে এসে প্রাচীন কলিঙ্গ বা উৎকল দেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে চরিত্রপুর বন্দরের কাছাকাছি পাঁচটি বড় বৌদ্ধস্তূপ দেখেছিলেন। একাধিক ঐতিহাসিকের মতে, সেকালের সেই চরিত্রপুরই একালের পুরী এবং স্তূপগুলোর কোনও একটাকে কেন্দ্র করেই জগন্নাথদেবের মন্দির হয়েছে। মতান্তরে, পুরী আদতে প্রাচীন দন্তপুর, যেখানে কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্ত খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শতকে বুদ্ধদেবের দন্তের ওপর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এমনকী, জগন্নাথদেবের মন্দিরের কামপরবশ মূর্তিগুলোও খোদিত হয়েছে কালচক্রযানী বৌদ্ধদের প্রভাবে। পক্ষান্তরে, জগন্নাথদেবের মন্দিরে হাতে-লেখা তালপাতার পুঁথি 'মাদলাপঞ্জী' থেকে জানা যায়, ৪৭৪ খ্রিস্টাব্দে কলিঙ্গের সিংহাসনে বসেন কেশরীবংশের প্রতিষ্ঠাতা জয়তী কেশরী। তিনিই জগন্নাথদেবের মন্দিরের আদি নির্মাতা। তবে বর্তমান মন্দিরটি ১১৯৬ খ্রিস্টাব্দে উৎকলের রাজা গঙ্গবংশীয় অনঙ্গভীমদেও সেই আমলেই প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি করেন। প্রথমে যে তিনটি বিগ্রহ তিনি স্থাপন করেছিলেন, সেগুলি কালাপাহাড়ের হাতে ধ্বংস হলে, পরবর্তীকালের উৎকল রাজ রামচন্দ্র আবার নিমকাঠের তিনটি মূর্তি তৈরি করিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

জগন্নাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে যে-কাহিনি প্রচলিত, সেই জনশ্রুতিরও রকমফের আছে। যেমন, সাধারণ ভক্তজনের বিশ্বাস : সত্যযুগে উজ্জয়িনীর বিষ্ণুভক্ত সূর্যবংশীয় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন একবার বিষ্ণুমন্দির নির্মাণের অভিলাষে উপযুক্ত জায়গা খুঁজতে খুঁজতে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে এসেছিলেন। তিনি সেখানে পুজো ও যজ্ঞ করে, বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করলেও, কেমন বিগ্রহ স্থাপন করবেন, তা ভেবেচিন্তে, বিচার-বিবেচনা করেও পেলেন না। তখন স্বয়ং বিষ্ণু তাঁকে রাত্রে স্বপ্নে জানালেন, 'ভোরবেলা সমুদ্রতীরে একখানা প্রকাণ্ড কাঠ ভেসে যাচ্ছে দেখতে পাবে। সেই কাঠ থেকে আমার সনাতনী মূর্তি গড়ে নাও।' পরদিন ভোরে কাঠখানা খুঁজে পেয়ে রাজা বিভিন্ন যশস্বী শিল্পীকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু কেউই বিগ্রহ তৈরি করতে সক্ষম হলেন না। রাজা তো হতাশ, সেই ক্ষণে বিশ্বকর্মাকে সঙ্গে নিয়ে ছদ্মবেশে বিষ্ণু স্বয়ং এলেন তাঁর কাছে। কুশলী ভাস্কর বলে বিশ্বকর্মার পরিচয় দিয়ে, তাঁরই হাতে বিগ্রহ নির্মাণের ভার দিতে অনুরোধ করলেন। তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন নবাগত বৃদ্ধ শিল্পীকে কৃষ্ণ, সুভদ্রা ও বলরামের মূর্তি বানাতে নির্দেশ দিলেন।

বিশ্বকর্মার শর্ত ছিল, তিনি নির্মাণশালার দরজা বন্ধ করে, একুশ দিন ধরে দেবতার রূপদান করবেন, ফলে যতদিন না কাজ শেষ হয়, ততদিন

কেউই দরজা খুলতে পারবে না। রাজা তাঁর শর্ত মেনে নিলেন। একটি করে দিন কাটতে লাগল। রাজা অপেক্ষমান। অথচ বাইরে থেকে ভিতরের কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। রানি গুণ্ডিচা তো কৌতূহলে ফেটে পড়ছেন। যদিও ভিতরে কী হচ্ছে, তা জানার বা বোঝার উপায় নেই। এইভাবে পনেরো দিন কেটে গেলে রাজা ও রানি অস্থির হয়ে উঠলেন। রাজা আর আত্মসংবরণ করতে পারলেন না। রানির ইন্ধনে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে রাজা সোজা গিয়ে নির্মাণশালার দরজায় ধাক্কা মারলেন। আশ্চর্য! দরজা খুলল না। অবশেষে রাজাদেশে ভৃত্যরা দরজা ভেঙে ফেলল। রাজা মরিয়া হয়ে ঘরে ঢুকে দেখলেন, তিনটে অসম্পূর্ণ মূর্তি পড়ে আছে— তাদের হাত-পা-চোখ নেই আর ভাস্কর উধাও।

এমন অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে রাজা তো প্রথমে ভেঙে পড়লেন। তারপর এর একটা বিহিত করতে ব্রহ্মার কাছে কাতর প্রার্থনা জানালেন। ঘটনা শুনে ব্রহ্মা স্বয়ং বিগ্রহগুলির অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় সংস্থাপন করে, নিজে পুরোহিত হয়ে পুজো করলেন।

মতান্তরে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নাকি মন্দির নির্মাণ করেও মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। সেই কারণে নীল পর্বতে প্রায়োপবেশনে আত্মহননের চেষ্টা করেন। ওই সময়ে দৈববাণী হয়— বিগ্রহ বালির নীচে চাপা পড়ে আছে, যথাসময়ে মূর্তি স্বয়ং চলে আসবেন দেবালয়ে। ইন্দ্রদ্যুম্ন তখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, আকুল প্রতীক্ষায় থাকেন। এক সময় নারদ এসে বালির তলা থেকে নৃসিংহ মূর্তি উদ্ধার করে, মন্দিরে নিয়ে আসেন। রাজা নৃসিংহদেবকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। অব্যবহিত পরে রাজা স্বপ্নে জগন্নাথদেবের অবয়ব দেখে, সমুদ্রতটে অবস্থিত এক সুগন্ধী গাছ থেকে জগন্নাথদেবের বিগ্রহ গড়ে, প্রতিষ্ঠা করেন।

পক্ষান্তরে, যদুবংশ ধ্বংসের পর কৃষ্ণের মৃত্যু হলে, তাঁর মরদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নাকি যদুবংশের রাজধানী দ্বারকায় হয়নি। কৃষ্ণের ভগ্নিপতি অর্জুন নীলাচলের সমুদ্রতীরে শ্যালকের মৃতদেহ দাহ করতে পাঠান। কিন্তু শবদাহ শেষ হবার আগেই সমুদ্রের ঢেউয়ে চিতা নিভে যায়। দেহাবশেষ-সহ পোড়া কাঠগুলো জলে ভেসে গেলে, সেগুলো তুলে আনেন শবর জাতির সর্দার বিশ্বাবসু বা বসু শবর। ওই দেহাবশিষ্ট-সহ খণ্ড কাঠগুলো তিনি গভীর জঙ্গলে, গাছতলার বেদিতে রেখে আরাধনা করতে থাকেন। পরে ইন্দ্রদ্যুম্ন জানতে পেরে কৌশলে সেই অস্থি ও খণ্ডকাঠ চুরি করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, কয়েকজন কৃষ্ণভক্ত নাকি ওই অস্থি-কাঠ রাজাকে উপহার দেন। অতঃপর স্বয়ং বিষ্ণুর আদেশে তার নির্মীয়মাণ দারুবিগ্রহের ভিতরে কৃষ্ণের দেহাবশেষ রাখার ব্যবস্থা করেন রাজা।

আর একটি গল্প হলো : কৃষ্ণের অস্থি-সহ কাঠখণ্ডগুলো বহুকাল পরে জমে নীল রঙের পাথর হয়ে গিয়েছিল। শবর সর্দার বিশ্বাবসু 'নীলমাধব' নামে সেই নীল পাথরখণ্ড পাহাড়তলির বনভূমে গোপনে পুজো করতেন। কোনও সময়ে জনৈক বৈষ্ণব সাধু ধ্যানে তা জানতে পেরে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের কাছে এসে ভগবানের আবির্ভাব বিষয়ে খবর দেন। নীলমাধবকে দর্শন করার বাসনায় ব্যাকুল হয়ে উঠে রাজা অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দিগ্‌বিদিকে পাঠালেন অজ্ঞাত দেবতার সন্ধানে। কিন্তু কেউই দেবতার সন্ধান দিতে পারল না। একমাত্র রাজপুরোহিতের ছেলে বিদ্যাপতি বহু কষ্টে শুধু এইটুকু জানতে পারলেন যে, নীলমাধব এক অজানা স্থানে বিরাজিত এবং এক বুড়ো শবর তাঁর উপাসনা করেন।

রাজার আদেশে চারদিক খুঁজে খুঁজে বিদ্যাপতি অভীষ্ট শবরপল্লীর সন্ধান পেলেন। পেয়েই পথ হারানো পথিক সেজে রাতের বেলা শবরপল্লীতে ঢুকে পড়লেন। এক কুটিরে গিয়ে একজন সুন্দরী যুবতীর দেখা পেলেন। সে বিশ্বাবসুর মেয়ে ললিতা। তার কাছে পথভোলা পরবাসী বলে নিজের পরিচয় দিয়ে আশ্রয় চাইলেন। সেই সঙ্গে কৌশলে ললিতার পরিচয়ও জেনে নিলেন বিদ্যাপতি। ললিতার পরিচয় পেয়েই বিদ্যাপতি বুঝতে পারলেন, তিনি সঠিক জায়গাতেই হাজির হয়েছেন আর তাঁর অভিযানও অর্ধেক সফলতা পেয়ে গেছে। এদিকে, ললিতা তো এই আগন্তুককে প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হয়েছিল, সুতরাং বাপের অনুপস্থিতিতে ঝুঁকি নিয়েও অতিথিকে গোপনে আশ্রয় দিল। এরপর থেকে সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন বিদ্যাপতি। বিশ্বাবসু মাঝরাতে নীলমাধবের পুজো করতে যেতেন। বিদ্যাপতিও পর পর কয়েকদিন তাঁকে অনুসরণ করলেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। বিশ্বাবসু দুর্ভেদ্য অরণ্যে কোথায় যে হারিয়ে যেতেন, ঠাহর করতে না পেরে বিদ্যাপতি দিশেহারা হয়ে ফিরে আসতেন। ইত্যবসরে ললিতা পরদেশীর প্রেমে পড়ে গেছেন। শবররাজের অগোচরে উভয়ের প্রণয়লীলা জমে উঠতেই, বিদ্যাপতি দয়িতাকে চাপ দিলেন বাপের কাছ থেকে নীলমাধবের রহস্য উন্মোচন করতে। যদিও শত চেষ্টাতেও কন্যা বাপের মুখ থেকে গোপন বিষয়টি কিছুতেই বের করতে পারল না। অগত্যা একদিন বিদ্যাপতি সাহস করে শবররাজের কাছে আত্মপ্রকাশ করলেন। আরও জানালেন, নীলমাধবই তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করে, পথ ভুলিয়ে শবরপল্লীতে এনেছেন। প্রতি রাতেই নীলমাধব তাঁকে স্বপ্নে দেখা দেন। অতএব, নীলমাধব দর্শন তাঁর একান্তই কাম্য।

আগন্তুক দেখে প্রথমে বিস্মিত হলেও মেয়ের পছন্দের তারিফ করলেন বিশ্বাবসু। অবশ্য পণ্ডিত ও সুপুরুষ বিদ্যাপতি বাপ-মেয়ের কাছে নিজের আসল পরিচয় লুকিয়েই রেখেছিলেন। অবশেষে মেয়েরই অনুনয়-বিনয়ে শবররাজ নিমরাজি হলেন হবু জামাইকে নীলমাধব দেখাতে। মধ্যরাতে চোখ বেঁধে বিদ্যাপতিকে নিয়ে বিশ্বাবসু চললেন দেবতা দর্শনে। চতুর বিদ্যাপতিও শবররাজের অলক্ষ্যে কুটির থেকে বনপথে সরষে ছড়াতে ছড়াতে হাঁটা দিলেন। পাহাড়ের নীচে বনগহনে বিশ্বাবসু বিদ্যাপতিকে কাঙ্ক্ষিত নীলমাধবের 'অবয়ব' দেখালেন। দেখে, কুটিরে ফিরে কাউকে কিছু না জানিয়ে, ভোররাতে বিদ্যাপতি রাজাকে খবর দেবার তাড়ায় তড়িঘড়ি পালিয়ে গেলেন।

কয়েকদিন পরে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সসৈন্যে হাজির হলেন ওই জঙ্গলে। পথ-প্রদর্শক বিদ্যাপতি। ততদিনে বনপথে বিদ্যাপতির ফেলা সরষে থেকে চারাগাছ বেরিয়ে গেছে। নতুন সরষেচারা দেখে দেখে রাজা ও বিদ্যাপতি লোকলস্কর নিয়ে নীলমাধবের সামনে গেলেন। সহসা দেবতাকে তুলে ফিরতে গিয়ে নজরে পড়ল, বিশ্বাবসুর শবরবাহিনী তাঁদের ঘিরে ফেলেছে। তৎক্ষণাৎ দৈববাণী হলো : 'এতদিন নীলমাধব শবরের সেবা গ্রহণ করেছেন, এবার তিনি রাজার সেবা নেবেন। অতএব বিশ্বাবসু, তুমি রাজার পথ ছেড়ে দাও। নীলমাধবকে যেতে দাও।'

দৈববাণী শুনে শবররাজ কাঁদতে লাগলেন। রাজা তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'বিশ্বাবসু, আমি নীলমাধবকে প্রতিষ্ঠা করব। তুমিও আমার সঙ্গে থাকবে আর ভগবানের সেবা-অর্চনার অংশীদার হবে।'

তারপর এক শুভদিনে বিদ্যাপতির সঙ্গে ললিতার বিয়ে হয়ে গেল। রাজাও নীলমাধবকে নিয়ে রাজ্যে ফিরলেন। আবার দৈববাণী হলো : 'রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, তুমি দারুব্রহ্ম মূর্তি নির্মাণ করে, তার ভিতরে আমাকে স্থাপন করো, যাতে সাধারণ লোক আমাকে দেখতে না পায়।' এইসব

কিংবদন্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিশ্বকর্মার এই দারুবিগ্রহ নির্মাণের প্রসঙ্গ।

হিন্দুর দেবদেবীদের মধ্যে এক গণেশ ছাড়া জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের মূর্তি একেবারে অন্যরকম বা অভিনব বলা চলে। প্রথমত, ভাইবোন একত্রে পুজিত হচ্ছেন, এটা সচরাচর চোখে পড়ে না। দ্বিতীয়ত, দেবতা আছেন অথচ বাহন নেই, সেটাও আর এক বিস্ময়। তৃতীয়ত, তিনমূর্তির দৃশ্যত হাত-পা নেই, একখণ্ড করে কাঠের ওপরের চোখ-মুখ আঁকা— এইসব লক্ষণ দেখে সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করেন, আদিতে সম্ভবত জগন্নাথ ছিলেন শবরজাতির উপাস্য কোনও বনদেবতা। সেই নিরিখেই জগন্নাথের পূজার্চনায় আদিম সংস্কার আজও সক্রিয়। পক্ষান্তরে, ঐতিহাসিকদের অভিমত, এহেন তিন বিগ্রহ বৌদ্ধ শাস্ত্র অনুসারে ত্রিরত্ন বা ত্রিশরণ বুদ্ধ, ধম্ম ও সঙ্ঘেরই রূপান্তর। বৌদ্ধ শাস্ত্রে ধম্ম স্ত্রীলিঙ্গ এবং বুদ্ধ ও সঙ্ঘ পুংলিঙ্গ শব্দ। এখানেও স্ত্রীলিঙ্গ ধম্মের প্রতীক সুভদ্রা। আবার বৌদ্ধধর্মের মতো পুরীতেও জাতিভেদ নেই। শ্রীক্ষেত্রে কখনও অন্ন উচ্ছিষ্ট হয় না। বস্তুত, ওড়িশার লোকগীতিতে বুদ্ধদেব ও জগন্নাথ অভিন্ন। কবি জয়দেবও বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর নবম অবতার রূপে কল্পনা করেছেন।

পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরে জগন্নাথদেবের সঙ্গে পাশাপাশি বিরাজ করেন সুভদ্রা ও বলরাম। এখন তাঁদের প্রসঙ্গেও কিছু কথা বলব। কৃষ্ণের বাবা বসুদেবের ঔরসে, তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী রোহিণীর গর্ভে বলরামের সহোদরা সুভদ্রার জন্ম হয়। সুভদ্রা কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় বোন এবং অর্জুনের দ্বিতীয়া স্ত্রী। অর্জুন ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে বারো বছর বনবাসে থাকার সময় কৃষ্ণ রৈবত পর্বতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। সঙ্গে ছিলেন সুভদ্রা। তাঁকে দেখে অর্জুন মোহিত হন। পরে কৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে দ্বারকায় বিয়ে করেন। অর্জুনের ঔরসে সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম হয়। মহাপ্রস্থানের সময় যুধিষ্ঠির সুভদ্রার নাতি পরীক্ষিৎকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করে সুভদ্রাকে ধর্মরক্ষা এবং রাজবংশের সমস্ত নর-নারীকে পালনের ভার দিয়ে, চলে যান।

আর বলভদ্র ও বলদেব নামেও পরিচিত বলরাম বিষ্ণুর দশাবতারের অন্যতম। তিনি কৃষ্ণের বড় ভাই বলদেব ও রোহিণীর সন্তান। দেবকী যখন সপ্তমবার গর্ভধারণ করেন, তখন দেবী যোগমায়া তাঁর গর্ভ সঙ্কর্ষণ করে, বলরামের ভ্রূণ তুলে নিয়ে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করেন। মতান্তরে, বলরাম নাগরাজ বংশের শেষনাগ। সেই কারণে, তাঁর মৃত্যুকালে (দ্বারকায় বটগাছের তলায় যোগসমাহিত অবস্থায়) রক্তবর্ণ সহস্রফণা শেষনাগ তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে সমুদ্রে চলে যায়। রাজা রৈবতের কন্যা রেবতী বলরামের স্ত্রী। তাঁদের দুই ছেলে— নিশধ ও উল্মক।

বলরাম বাল্যকালে কৃষ্ণের সঙ্গে নন্দ গোয়ালার বাড়িতে প্রতিপালিত হন। সান্দীপনি মুনির কাছে বেদ, কলা, ধনুর্বেদ, ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি কৃষ্ণের সব কর্মকাণ্ডের সহায়ক ও লীলাসহচর। বাল্যেই গাধারূপী রাক্ষস ধেনুকাসুরকে চার পা ধরে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মেরে ফেলেন। কৃষ্ণের সঙ্গে মথুরায় গিয়ে কংসকে বধ করতে সাহায্য করেন। কংসের শ্বশুর জরাসন্ধ গদাযুদ্ধে বলরামের কাছে পরাজিত হন। বলরামের অস্ত্র রূপে গদা, হল, মুষল প্রসিদ্ধ। তিনি দুর্যোধন ও ভীমকে গদাযুদ্ধের কৌশল শেখান। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের সময় বলরাম নিরপেক্ষ ছিলেন। তখন তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়েন।

কোনও কোনও গবেষক বলেছেন, শ্রীচৈতন্যদেবের পুরী গমনের আগে ওড়িশার বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবধর্মে বলরামের প্রাধান্য ছিল।

পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরে বারো অথবা উনিশ বছর অন্তর 'মলমাস' আষাঢ়ে 'নবকলেবর' নামে দেবতার নতুন মূর্তি প্রতিষ্ঠার এক অনুষ্ঠান দেখা যায়। সেই অনুষ্ঠানে কিছু একটা অজ্ঞাত জিনিস পুরোনো কলেবর থেকে বের করে, নতুন কলেবরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ঐতিহাসিকদের মতে, ওটা বুদ্ধের দাঁত হতে পারে। এর নেপথ্যে যে-আখ্যান চালু আছে, তা হলো : বুদ্ধদেবের নির্বাণের পর, তাঁর জ্বলন্ত চিতা থেকে ক্ষেম নামে এক শিষ্য একটা দাঁত তুলে এনে কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তকে উপহার দেন। ব্রহ্মদত্ত নিজের রাজধানী দন্তপুরে (এখনকার পুরী) দাঁতটি স্থাপন করেন। তখন থেকেই বৌদ্ধধর্ম ওড়িশায় প্রবেশ করে। পরবর্তীকালে তৃতীয় শতকে দন্তপুরের রাজা গুহাশিব ব্রাহ্মণ্যধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হয়ে যান। সেই সময় দাঁতের অধিকার নিয়ে পাটলিপুত্রের রাজা পাণ্ডুর সঙ্গে তাঁর বিরোধ হয়। গুহাশিব তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে, দাঁতটি পাণ্ডুকে দেবার জন্য পাটলিপুত্রে যান। কিন্তু স্বস্তিপুররাজ ওই দাঁতটি নেবার তাগিদে পাটলিপুত্র আক্রমণ করে, পাণ্ডুকে হত্যা করেন। সুযোগ বুঝে, গুহাশিব দাঁত নিয়ে দন্তপুরে পালিয়ে আসেন। পরে স্বস্তিপুররাজের মৃত্যু হলে, দাঁতের স্বার্থে তাঁর ভাইপোরা দন্তপুর আক্রমণ করে। যুদ্ধে গুহাশিব নিহত হন। তাঁর জামাই মালবরাজ দাঁতটি সমুদ্রতীরে বালির মধ্যে পুঁতে রাখেন। অনেক শতাব্দী পরে, সেই দাঁতটি তুলে এনে জগন্নাথ বিগ্রহের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়।

সাধারণত জগন্নাথদেবের প্রধান দুটি উৎসব স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা। তার মধ্যে আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে, কর্কট রাশির পুষ্যা নক্ষত্রে রথযাত্রা উৎসব হয়। অনেক সময়ে তিথির সঙ্গে রাশি-নক্ষত্রের সংযোগ না থাকলেও তিথির প্রাধান্যেই উৎসব পালনের রীতি। জগন্নাথের রথের নাম নন্দিঘোষ, সুভদ্রার রথ দর্পদলন বা দেবীরথ আর বলরামের তালধ্বজ। প্রতিটি রথে থাকেন নয়জন সঙ্গীদেবতা, চারটে ঘোড়া ও সারথি। পুরীতে জগন্নাথদেবের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের সমন্বয় সাধন হয়েছে। শৈব ও শাক্ত দৃষ্টিতে জগন্নাথ পুরীর শক্তিপীঠের দেবী বিমলার ভৈরব পুরুষোত্তম। বৈদান্তিকের কাছে তিনি প্রণবতনুধর, তন্ত্রমতে হংসতত্ত্ব, জৈন ধারণায় মহাতীর্থঙ্কর সিদ্ধান্তমূর্তি, বৌদ্ধশাস্ত্রে নবম অবতার আদিযুদ্ধ আর বৈষ্ণব বিশ্বাসে তিনি শ্রীকৃষ্ণ।

জগন্নাথ মন্দিরের মূর্তিগুলির ব্যাখ্যা পুরাণে নানাভাবে বর্ণিত আছে। এই মূর্তিগুলিকে বলা হয় বিরাট, সূত্রাত্মা, অন্তর্যামী ও শুদ্ধির প্রতীক। বলভদ্র বিরাট, সুভদ্রা, সুত্রাত্মা, জগন্নাথ অন্তর্যামী ও সুদর্শন (শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শন চক্রের প্রতীক একটি কাঠের দণ্ড) শুদ্ধ।

সংহিতা অনুসারে, তাঁরা বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তূরীয়র প্রতীক। বলরাম বিশ্ব, সুভদ্রা তৈজস, জগন্নাথ প্রাজ্ঞ ও সুদর্শন তূরীয়। আবার স্কন্দপুরাণ ও পঞ্চসখা যুগের দার্শনিকদের ব্যাখ্যা : জগন্নাথ সাম, বলরাম ঋক, সুভদ্রা যজুঃ এবং সুদর্শন অথর্ব। এখানে চার বিগ্রহকে বেদময় পুরুষ রূপে কল্পনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, জগন্নাথ অব্যক্ত পুরুষ, সেই অব্যক্ত পুরুষ নিজের ইচ্ছারূপিণী শক্তি, সুভদ্রা ও বিরাটরূপী বলরামের মাধ্যমে ব্যক্ত। ওই ব্যক্তাবস্থায় প্রকাশিত শক্তিই সুভদ্রা ও বিরাট স্থূল জগৎ বলভদ্র এবং সৃষ্টির কালতত্ত্ব সুদর্শন রূপে রত্নবেদিতে প্রকাশিত। নীলমাধব শব্দের ব্যাখ্যা হলো : নীল, মা, ধব। নীল অর্থাৎ জগন্নাথ (রঙ তাঁর নীল বা কালো) মহাবিশ্ব বা মহাশূন্যের লৌকিক প্রকাশ, মা অর্থাৎ দেবী সুভদ্রা— ঐশ্বর্যের প্রতীক পীতবর্ণ মা লক্ষ্মী আর ধব মানে বলভদ্র— শুভ্র ক্ষমতার প্রতীক। ■

এই সময়

সুরক্ষায়

কেন্দ্রের একাধিক প্রকল্পে উপকৃত হয়েছেন মহিলারা। গত চার বছরে তারা যে আর্থিক দিক

থেকে স্বনির্ভর হয়েছেন শুধু তাই নয়, জীবনের নানান অনিশ্চয়তার সঙ্গে যোঝার ব্যাপারেও পারদর্শী হয়েছেন। সম্প্রতি একথা বলেছেন নরেন্দ্র মোদী। সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে উপকৃতদের সমাবেশে তিনি এই মন্তব্য করেন।

ফোনে পাসপোর্ট

পাসপোর্টের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়ানোর দিন শেষ। আপনার কাছে যদি

স্মার্টফোন থাকে তাহলে পাসপোর্ট সেবা অ্যাপ ডাউনলোড করে নিন। এই অ্যাপের মাধ্যমেই মিলবে পাসপোর্ট। বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ সম্প্রতি এই পরিষেবার কথা ঘোষণা করেছেন।

চাকরি ৪১ লাখ

বিরোধীরা অভিযোগ করেন নরেন্দ্র মোদীর

জমানায় কর্মসংস্থান নাকি তেমন হয়নি। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিস (সিএসও) সম্প্রতি কর্মসংস্থান সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট পেশ করেছে। জানা গেছে, শুধুমাত্র গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে এ বছরের এপ্রিলের মধ্যে ৪১ লক্ষ বেকারের চাকরি হয়েছে।

সমাবেশ -সমাচার

কলকাতায় ক্রীড়া ভারতীর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপন

'ভারতের যোগ সারা পৃথিবী গ্রহণ করেছে ও মান্যতা দিয়েছে— এ ভারতের গৌরব। আর এই গৌরব এনে দেওয়ার ভগীরথ হলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।' গত ২১ জুন ক্রীড়া ভারতীর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে কলকাতার রানি রাসমণি রোডে সকাল ৬টায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে একথা বলেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি তথা কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রী ড. মহেশ শর্মা। এদিন কলকাতার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী-সহ দু'-হাজার পুরুষ-মহিলা বেশ কয়েকটি যোগাসন ও প্রাণায়াম অভ্যাস করেন। অনুষ্ঠানে ড. শর্মা ছাড়া বেঙ্গালুরু স্বামী বিবেকানন্দ যোগ অনুসন্ধান সংস্থানের কলকাতার ডিরেক্টর ড. অভিজিৎ ঘোষ, বাণীপুর শারীরশিক্ষা মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা ক্রীড়া ভারতীর সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি তপনমোহন চক্রবর্তী, উলুবেড়িয়া মহাবিদ্যালয়ের

অধ্যাপিকা শ্রীমতী মৌসুমী মজুমদার, অনুষ্ঠানের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল দীপক ভট্টাচার্য এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পর্বতারোহী তথা ক্রীড়া ভারতীর কলকাতার সভাপতি দেবাশিস বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। যোগ অনুশীলনের পর আন্তর্জাতিক যোগ উদ্‌যাপন সমিতির পক্ষ থেকে তিনজন উদীয়মান প্রতিভার জননী, যথাক্রমে— এশিয়াড ও কমনওয়েলথ গেমসে ভারোত্তোলনে পুরস্কার বিজয়ী দুর্গাপুরের কৌস্তভ ঘোষের মা চিত্রা ঘোষ, বাংলার ঐতিহ্যবাহী ঘোসে'স্ যোগ কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মুক্তমালা ঘোষের মা অঞ্জনা ঘোষ এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পর্বতারোহী দেবাশিস বিশ্বাসের মা শ্রীমতী বিমলা বিশ্বাসকে বীরমাতা জীজাবাঈ সম্মানে ভূষিত করা হয়। অনুষ্ঠানে ক্রীড়া ভারতীর ক্ষেত্রীয় সংগঠক মধুময় নাথ-সহ বহু কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

লোকতন্ত্র সেনানী সঙ্ঘের মেদিনীপুর জেলা অধিবেশন ও সত্যাগ্রহীদের সম্মাননা প্রদান

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মেদিনীপুর জেলার স্বয়ংসেবকদের ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থা জারির প্রতিবাদে সত্যাগ্রহের মাধ্যমে কারাবাসের স্মৃতিচারণা করা হয় মাদপুর সরস্বতী শিশু মন্দিরের সভাকক্ষে। মেদিনীপুর জেলায় মোট ৪৮ জন স্বয়ংসেবক সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেন। তার মধ্যে ৮ জন স্বর্গত হয়েছেন। পরলোকগত দু'জন সত্যাগ্রহীর বিধবা স্ত্রী তাঁদের স্বামীর হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। ৪২ বছর আগে প্রথম ব্যাচে ব্যবহারজীবী ও

এই সময়

জয়ী ট্রাম্প

আমেরিকার সীমানা পেরিয়ে ইরান, লিবিয়া, সোমালিয়া, সিরিয়া এবং ইয়েমেনের মুসলমান

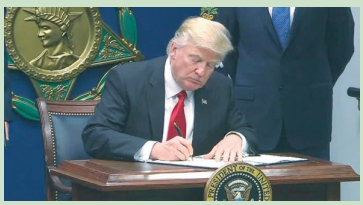

নাগরিকদের অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প ট্র্যাভেল ব্যানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সম্প্রতি আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছে।

যুবকদের জন্য

জরুরি অবস্থার সময় দেশের হাল কী হয়েছিল বর্তমান প্রজন্মের তা জানা উচিত। সেই

অন্ধকার দিনগুলোর কথা না জানলে তারা বুঝতে পারবেন না স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলার অর্থ কী হতে পারে। সম্প্রতি একথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি কংগ্রেসকে জরুরি অবস্থার জন্য দায়ী করেন।

কবাডি মাস্টার্স

পাকিস্তানকে ৪১-১৭ পয়েন্ট হারিয়ে ভারত কবাডি মাস্টার্স চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৮-র

সেমিফাইনালে উঠল। সেমিফাইনালে ভারত ইরানের বিরুদ্ধে খেলবে। অধিনায়ক অজয় ঠাকুর, রোহিত কুমার এবং মনু গোয়েতকে নিয়ে গড়া ভারতীয় দল অসাধারণ খেলেছে।

জেলার সঙ্ঘ কাজের অন্যতম পুরোধা লহর মজুমদার-সহ ১১ জন সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেন। তাঁদের প্রথমে থানা, তারপর সাব-জেল ও শেষে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে

স্থানান্তরিত করা হয়। তিন মাস থেকে শুরু করে একেক জন জরুরি অবস্থার পুরো ২১ মাস কারারুদ্ধ ছিলেন। প্রচারক ও বিশিষ্ট হিন্দুত্ববাদী লেখক শিবপ্রসাদ রায়, জনসঙ্ঘের বিধায়ক হরিপদ ভারতী ও তৎকালীন প্রচারক অনন্তলাল সোনী এবং ধর্মচাঁদ নাহার সবার প্রেরণা ছিলেন। সত্যাগ্রহী স্বয়ংসেবকরা এদিন সত্যাগ্রহ ও কারাজীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। সভা পরিচালনা করেন সুতনু সাঁতরা। সঞ্চালন করেন নিতাইচরণ দত্ত। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিভাগ সঙ্ঘচালক চন্দন কান্তি ভুঁইয়া। শ্রদ্ধা জানানো হয় মেদিনীপুরের সেই বীর যোদ্ধাদের প্রতি যাদের ওপর চুঁচুড়া জেলে বন্দি অবস্থায় নির্যাতন চালানো হয়। বিশেষ করে হুতাত্মা প্রচারক সুধাময় দত্ত যাঁকে হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হয় দীর্ঘদিন। পরবর্তীকালে তিনি ত্রিপুরায় সংগঠনের কাজে খ্রিস্টান জঙ্গিদের হাতে বন্দি হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন।

সংস্কার ভারতী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ১৭ জুন কলকাতার বড়বাজার লাইব্রেরিতে সংস্কার ভারতী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের ২০১৭-১৮ সালের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টায় অখিল ভারতীয় সংস্কার ভারতীর অন্যতম সম্পাদক বিশিষ্ট বংশীবাদক পণ্ডিত চেতন যোশী সভার উদ্বোধন

করেন। উদ্বোধনী মঞ্চে ছিলেন পূর্বক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক নিরঞ্জন পণ্ডা, প্রান্তের সহ-সভানেত্রী নীলাঞ্জনা রায়। বিভিন্ন অধিবেশনে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত, বিকাশ ভট্টাচার্য, সুভাষ ভট্টাচার্য, সম্পর্ক অধিকারী

এই সময়

প্লাস্টিকে রাস্তা

গত ২৩ জুন মহারাষ্ট্র সরকার মুম্বইয়ে প্লাস্টিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। প্রশ্ন

উঠেছিল বিপুল পরিমাণ বর্জ্য প্লাস্টিক নিয়ে কী করা হবে। বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনার পর সরকার জানিয়েছে প্লাসটিক ব্যবহার করা হবে রাস্তা তৈরিতে।

ওঁ নমঃ শিবায়

গত ২৮ জুন বিপুল উদ্দীপনা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মধ্যে অমরনাথ যাত্রা শুরু হয়েছে।

চলবে ২৬ আগস্ট পর্যন্ত। প্রতিবছর এই সময় ভক্তরা অমরনাথ দর্শনে পাড়ি দেন হিমালয়ে। এই তীর্থস্থানের অবস্থান কাশ্মীরের সিন্ধু উপত্যকায়, সিন্ধু নদ যে ছোট ব-দ্বীপ সৃষ্টি করেছে তার পাশেই। জায়গাটির নাম অমরাবতী।

তারুণ্যের জয়

আই এস এস এফ জুনিয়র শুটিং ওয়ার্ল্ড কাপে ভারতের তরুণ শুটাররা অসাধারণ মুন্সীয়ানা

দেখাল। ভারত দুটি সোনা, একটি রুপো এবং একাধিক ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে। পদকজয়ী শুটারদের মধ্যে আছেন অর্জুন চিমা, আনমোল জৈন, গৌরব রানা, দেবাংশী ধামা প্রমুখ।

সমাবেশ -সমাচার

শক্তিশেখর দাস, বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত শিল্পী ড. স্বপন মুখোপাধ্যায় এবং সুরকার ও সঙ্গীত শিল্পী প্রশান্ত ভট্টাচার্য। এবারে প্রান্তের সভাপতিরূপে নির্বাচিত হন স্বনাধন্য ওড়িশী নৃত্যসাধিকা অলকা কানুনগো। সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হন যথাক্রমে ভরত কুণ্ড ও গোপাল কুণ্ডু। সহ-সভাপতি গুরু বিশ্বাস, স্বপ্না চক্রবর্তী (লোকসঙ্গীত শিল্পী) ও নীলাঞ্জনা রায়। সংগঠন সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত, সহ-সংগঠন সম্পাদক প্রবীর ভট্টাচার্য এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে মনোনীত হন বাসুদেব সাহা, নিখিল সমাদ্দার, ধ্রুবজিত ভট্টাচার্য ও সুজিত চক্রবর্তী। বিভিন্ন সময়ে সঙ্গীত পরিবেশন করেন মীরা ভট্টাচার্য, মিতালী ভট্টাচার্য, স্বপ্না ব্যানার্জী, মীরা দাস, বীণা গুহ, সুজাতা ভট্টাচার্য, তনুশ্রী মল্লিক ও গীতশ্রী চক্রবর্তী। সবশেষে রাষ্ট্রগীত পরিবেশন করেন স্বরূপ মিত্র।

হিন্দু মহাসভার সাভারকর জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

গত ২৮ মে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে হিন্দু রাষ্ট্রবাদের জনক বিপ্লবী বীর সভারকরের ১৩৫ তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন হিন্দু মহাসভার রাজ্য সভাপতি শম্ভুনাথ গাঙ্গুলি। অনুষ্ঠানে প্রধান

অতিথি প্রাক্তন সাংসদ ড. বিক্রম সরকার বীর সাভারকারের বৈপ্লবিক কর্মজীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পৌত্র চন্দ্রকুমার বসু বীর সাভারকরকে সত্যকার বিপ্লবী, প্রকৃত সংগঠক ও দক্ষ নেতা বলে উল্লেখ করে বলেন, তাঁর অনুপ্রেরণা এবং পরামর্শেই নেতাজী ভারতবর্ষ ত্যাগ করে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠনে উদ্যোগী হন। সভায় বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন পৌরপিতা শান্তিলাল জৈন, সুদীপ দাস, সাংবাদিক রথীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

দিল্লিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় প্রবন্ধ সমিতির বৈঠক

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় প্রবন্ধ সমিতির বৈঠক গত ২৪-২৫ জুন দিল্লির রাজঘাটস্থিত গান্ধী স্মৃতি সমিতির সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আশীর্বচন প্রদান করেন মহামণ্ডলেশ্বর পূজ্য স্বামী রাঘবানন্দ মহারাজ। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় অধ্যক্ষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিষ্ণু সদাশিব কোকজে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যাধ্যক্ষ অলোক কুমার ও অশোক চৌগুলে (বিদেশ), সর্বভারতীয় সম্পাদক মিলিন্দ পরাণ্ডে, সংগঠন সম্পাদক বিনায়করাও দেশপাণ্ডে, উপাধ্যক্ষ চম্পত রায়, ওমপ্রকাশ সিংহল, জীবেশ্বর মিশ্র, হুকুমচন্দ সাঁওলা, জগন্নাথ সাহী, রামকৃষ্ণ নাইক, শ্রীমতী মীনাতাঈ ভট্ট, সহ-কোষাধ্যক্ষ গোপাল ঝুনঝুনওয়ালা প্রমুখ।

তুলসীমঞ্চ ছাড়া হিন্দু বাঙালির গৃহস্থালী অসম্পূর্ণ

চূড়ামণি হাটি

শঙ্খচূড় দৈত্য। কিন্তু দৈত্য বিনাশ প্রয়োজন। এদিকে ব্রহ্মার বরে স্ত্রীর সতীত্ব গুণে শঙ্খচূড় অমর। নারায়ণ ছল করে শঙ্খচূড়ের ছদ্মবেশ নিয়ে শঙ্খচূড়ের স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করেন। এর ফলে শিবের ত্রিশূলে শঙ্খচূড় বধ সম্ভব হলো। এক খণ্ড মাংস লেগে থাকা ত্রিশূল শিব সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। শিবের ইচ্ছেয় সেই মাংস টুকরোই শঙ্খ ও হিন্দু রমণীর সতীত্বের অংশ হলো। এদিকে লজ্জা ঘৃণায় শঙ্খচূড়ের স্ত্রী তুলসীগাছের রূপ নিল। বলাবাহুল্য রাম ও কৃষ্ণ কাহিনির সাথে জড়িয়ে আছে আরও দুটি কাহিনি। একটিতে রামচন্দ্র তুলসীগাছকে প্রশ্ন করেছিলেন পিতা দশরথের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের নিয়ম সীতা পালন করেছিলেন কী-না। তুলসী মিথ্যা বলে। যার ফলে সীতার অভিশাপে তুলসী পেল ক্ষুদ্র দশা। আর একটি মতে তুলসী নামে কৃষ্ণের এক অন্যতম গোপিনী ছিলেন। রাধার অভিশাপে তুলসী গাছের রূপ পেল। যেন এসব খণ্ড সত্য, খণ্ড কল্পনা। লৌকিক রূপ থেকে আধ্যাত্মিক রূপের দিকে যাত্রা। আধ্যাত্মিক ভাবনায় তুলসীগাছ মঞ্চ পেল। লৌকিক বিশ্বাস এই তুলসীতলায় বিষ্ণু ত্রি-সন্ধ্যা অর্থে সর্বদা বিরাজ করেন। স্থায়ী বিষ্ণু বা হরি মন্দির। চাকে ও 'শিড়া'-পদ্ধতির সাহায্যে তৈরি পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ।

নদীয়ার নবদ্বীপের চৈতন্যদেব এবং বীরভূমের একচক্রা গ্রামের নিত্যানন্দের নব্য বৈষ্ণব ধর্মীয় দর্শনে তুলসীমঞ্চ গুরুত্ব পেয়েছিল। যদিও বিষ্ণুপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে তুলসী প্রসঙ্গ আছে। দ্বাদশ শতকের শেষ ভাগে রচিত জয়দেবের গীতগোবিন্দে রাধাকৃষ্ণের প্রেম ভক্তিরস মাধুর্য নিয়ে বেশ আলোড়ন তুলেছিল। কিন্তু তুলসী মঞ্চ চর্চাটি গুরুত্ব পেল মন্দির শিল্পকে কেন্দ্র করে। স্থায়ী ভাবে এ মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু সমাজের বাস্তু ভূমিতে। বাড়ির মেয়েরা স্থানটিতে নিত্য সেবা বা পুজো দেন। পবিত্র ভূমি। প্রতি পূর্ণিমায় বিশেষ পুজো। আবার মন্দির, নাটমঞ্চ, স্নান-ঘাট যেমন একে অপরের সম্বন্ধ যুক্ত; তেমনি রাধাগোবিন্দ মন্দিরের সঙ্গে তুলসীমঞ্চের সম্বন্ধ। তুলসীমঞ্চ আসলে একটি ছোট্ট মন্দির। বাংলার পথে ঘাটের পরিচিত লৌকিক দেবদেবীদের থেকে আলাদা। ছবি-আলপনায় সাজানো। জড়িয়ে আছে লোকাচার-বিশ্বাস-সংস্কার এবং সৌন্দর্যচেতনা ও প্রেম-আনন্দ। যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি জনসংযোগের অসাধারণ ক্ষমতা নিয়ে ভক্ত মনকে আকৃষ্ট করে। অথচ ঘরোয়া। বলাবাহুল্য বৃক্ষ পুজোর রীতিটি যথেষ্ট প্রাচীন। আদিতে মানুষ ছিল সর্বপ্রাণবাদী; প্রকৃতির উপাসক। তারা বিশ্বাস করতো প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুর মধ্যে আত্মা আছে। বৃক্ষ পুজো, বিমূর্ত প্রতীক, আবার কখনো পশুই দেবতা; সর্বশেষ স্তরে এসেছে নরাকার দেবভাবনা। মানুষ তার নিজের মতো করে দেবতাকে ভেবেছে। হিন্দু সমাজে তুলসীমঞ্চে জল দেওয়া থেকে তুলসীপাতা তোলা সবই মন্ত্রনির্ভর। তুলসীপাতা ও মঞ্জরীর ঔষধী গুরুত্বও কিন্তু কম নয়। পরিবেশ বিজ্ঞানে তুলসীগাছ যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ। তুলসীগাছের কয়েকটি শ্রেণী ভাগ আছে। সবুজ বড় পাতা বিশিষ্ট স্ত্রীতুলসী, গাঢ় সবুজ-বেগুনি পাতা বিশিষ্ট কৃষ্ণ তুলসী, তীব্র গন্ধযুক্ত বন তুলসী বা

রামতুলসী, লবঙ্গের মতো গন্ধের ভুঁই বা বাবুই তুলসী, লম্বাটে পাতার সুগন্ধী তুলসী, কর্পূর তৈরিতে ব্যবহৃত কর্পূর তুলসী। যাই হোক, তুলসীগাছকে দেবীজ্ঞানে স্থান দেওয়ার অর্থ সৌখিন মানসিকতায় লৌকিক ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার পাশাপাশি পরিবেশ সচেতনতা ও স্বাস্থ্য সচেতনতার দৃষ্টান্ত স্থাপন। লোকসমাজের বিশ্বাস যার গৃহে তুলসীবন আছে, তার গৃহ তীর্থস্বরূপ; যারা বৈশাখ মাসে তুলসীগাছ লাগান তারা অশ্বমেধের ফললাভ করেন; যারা বিষ্ণু ও তুলসীর সেবা করে থাকেন তাদের ভোগ বাসনা পূর্ণ হয়। তাই তুলসীতলায় গোবর জলে লাতা দেওয়া, প্রণাম, পুজো, সন্ধ্যা দেওয়ার মতো রীতি পালন করা হয়।

ব্রত এবং অনেক পুজোর আয়োজন প্রস্তুতিতে তুলসীতলাকেই বেছে নেওয়া হয়। তুলসীমঞ্চকে কেন্দ্রে রেখে কীর্তন গান সাধারণ ঘটনা। শ্রীহরির পুজোর প্রধান উপকরণ তুলসীপাতা। চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের সময় তুলসীপাতার ব্যবহার লক্ষণীয়। প্রসাদ বা চরণামৃতের সঙ্গে তুলসীপাতা, সাধু সেবায় তুলসীপাতার ব্যবহার, হিন্দুধর্মে মৃতের চোখে তুলসীপাতা দেওয়ার রীতির মতো নানা প্রয়োজনে ব্যবহার। লৌকিক সংস্কারগত ধর্মীয় গুরুত্বই তুলসীগাছকে মঞ্চ দিয়েছে। ভূমি থেকে একটু উঁচুতে। ধীরে ধীরে উঁচু ঢিবি মন্দিরের রূপ নিয়েছে। যেহেতু গাছ তাই খোলা মন্দির। অধ্যাত্মবোধ ও শিল্পবোধের সমন্বয়। দশম-একাদশ শতকে বরাকরের শিল্পীদের তৈরি বেগুন আকৃতির বেগুনিয়া মন্দির এবং বিষ্ণুপুরে মল্লরাজাদের আমলে তৈরি চালাঘর ও জোড় বাংলো মন্দির চর্চার পাশাপাশি; ওড়িশার মন্দির- স্থাপত্য চর্চা বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর-সোনামুখী, মেদিনীপুরের দাসপুর, হুগলীর গুপ্তিপাড়ার সূত্রধরদের মন্দির চর্চাকে প্রভাবিত করেছিল। ধ্রুপদী শিল্প চর্চা; কিন্তু না ধ্রুপদী না লৌকিক। বাংলার মন্দির

শিল্পচর্চা আসলে উৎকর্ষের ঝোঁক। রেখ বা শিখর দেউল, ভদ্র বা পীড়া দেউল, শিখর যুক্ত ভদ্র দেউল বা খাখরা দেউল, স্তূপ যুক্ত ভদ্র দেউল বা গৌড়ীয় দেউল। এই চারটিই ধ্রুপদী নিদর্শন। কয়েকটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ছাড়া বাংলার মন্দির মূলত তিন ধরনের। প্রথম ধরনটি হলো বাংলার নিজস্ব পদ্ধতি। কুঁড়ে ঘরের আদল। দো-চালা। চার-চালা। দ্বিতল ঘরের অনুকরণে চার চালার উপর অলঙ্কৃত চারচালা নিয়ে আটচালা। দুটি দো চালার সংযোগে জোড় বাংলা। দ্বিতীয় ধরনটি হলো চালাঘরের মতো ঢালু ও বাঁকানো কার্নিস যুক্ত ছাদ আর এক বা একাধিক চূড়া সংবলিত রত্ন মন্দির; মূল গর্ভগৃহে একটি কুঠরী বানিয়ে সর্বচ্চ চূড়া। মধ্য চূড়া। মধ্যে একটি এবং চার কোণে চারটি চূড়া নিয়ে পঞ্চরত্ন। প্রয়োজনে মধ্য চূড়ার উপর আবার এক বা একাধিক তল তৈরি হয়। মূল গর্ভ গৃহেই দেবতার অধিষ্ঠান! আর মন্দির তলের সংখ্যা বাড়ালেই চূড়া বা রত্ন সংখ্যা বেড়ে যায়। চূড়াগুলি অলঙ্কৃত ছোট্ট-ছোট্ট গৃহ। তৃতীয় ধরনটি হলো সামনে খিলান যুক্ত বারান্দা-সহ সমতল ছাদ নিয়ে দালান মন্দির। বলাবাহুল্য এক সময় মন্দির বলে কিছুই ছিল না। যজ্ঞস্থান আর পথে ঘাটে পড়ে থাকা কোনও অলৌকিকতাকে আশ্রয় করে লৌকিক সমাজ ভিড় জমাতো। যাই হোক, বাংলার পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ কুম্ভকারদের তৈরি। বাংলার মন্দির শিল্পের ক্ষুদ্র রূপ। চালা মন্দির ও পঞ্চরত্ন মন্দিরের অপূর্ব মিশ্রণ। মাটির, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা ভঙ্গিতে নানা রূপে ইট-সিমেন্ট ও পাথরের হয়েছে। সেঁটে দেওয়া হচ্ছে এনামেল প্লেটে চিত্রিত রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তি। কিংবা তেল রঙে আঁকা। মাটির তুলসীমঞ্চের সন্ধান মিলবে মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া, তমলুক, সুতাহাটা, দাসপুর, খড়্গপুর, সনাবাজার, মির্জাবাজার এবং বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে।

পাঁচ ভাগ এঁটেল মাটির সঙ্গে এক ভাগ বালি মাটির মিশ্রণ একদিন ছায়ায় রেখে; সেটি দিয়ে দড়ির মতো লম্বাটে 'শিড়া' বানানো হয়। শিড়াগুলি কাঠের তক্তায় পর পর রেখে জুড়ে দেওয়া হয়। তারপর কাঠ দিয়ে পিটিয়ে তৈরি হয় হাফ থেকে এক ইঞ্চি পুরু সমতল দেওয়াল। দেওয়ালের সংখ্যা অনুসারে চার-ছয়-আট কোণা স্তূপ। উচ্চতায় পঁয়তাল্লিশ থেকে নব্বই সেন্টিমিটার। দুটি দেওয়ালের মধ্যবর্তী সংযোগ স্থলটি লম্বা কাদার পটি দিয়ে জোড়া দেওয়া হয়। অর্থাৎ তৈরি মঞ্চটির ভেতরটি ফাঁপা। নীচের সমতল ভূমির সঙ্গে সংযোগ রেখে মাটি ভরাট সম্ভব। চতুর্ভুজ কিংবা ষড়ভুজ কিংবা অষ্টভুজ মঞ্চটির প্রান্ত ভাগ এবং তার একটু উপরের চারপাশ কাদার পটি দিয়ে বেড়ি দেওয়া হয়; যাতে অল্প মাটির গভীরে থাকা মঞ্চটি সহজে উপড়ে তোলা না যায়। ঊর্ধ্বভাগের চালাটি ঢালু এবং বাংলার চালার মতো বাঁকানো। যার ভেতরটিতে থাকে একটি কাণা উঁচু অর্ধ কলস। কিংবা পরপর দুটি ছোটো অর্ধকলস। তৈরি হয় চাকের সাহায্যে। কাদার সাহায্য নিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়। তারপর দক্ষতার সঙ্গে উপরের চালাটি তৈরি করা হয়। উপরের কানা উঁচু কলসটিতেই তুলসীদেবীর অবস্থান। পরপর দুটি অর্ধকলস কাঠামো থাকলে; সংযোগ স্থলের বেড়িতে সেঁটে দেওয়া হয় বিষ্ণু বা কৃষ্ণের মুখ নিয়ে তিন-পাঁচটি সর্পফণা-ছত্রের ক্ষুদ্র রূপ এবং চক্র। চারপাশে পরপর সাজানো। তুলসীমঞ্চের দেওয়ালটিতে সেঁটে দেওয়া হয় অলঙ্কৃত মূর্তি পুতুল। ঠিক যেমন টেরাকোটার মন্দিরগুলি সাজানো হয় ছাঁচে তৈরি ফলক দিয়ে। নির্দিষ্ট প্যানেলে সাজানোর জন্য ফলকগুলির পেছনে থাকতো নির্দেশক চিহ্ন বা সংখ্যা। ক্ষুদ্র তুলসীমঞ্চগুলি কিন্তু সূত্রধরদের তৈরি এই ফলক দিয়ে সাজানো হয় না। কুম্ভকারদের তৈরি পুতুল। যেমন রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাম-সীতা, আলঙ্কারিক ফুল-নকশা। পাশাপাশি লেখা থাকে শিল্পী ও গৃহকর্তার পরিচিতি, প্রণাম বাক্য, কৃষ্ণ নাম। মোটামুটি পয়ার ছন্দে লেখার চেষ্টা। অনেক সময় তুলসীমঞ্চের নীচের দিকে ছোটো একটি খোপ কাটা থাকে। মূল উদ্দেশ্য প্রদীপ শিখাকে হাওয়া থেকে একটু আড়াল করা। মুদ্রা উৎসর্গ কিংবা অন্য কোনও ঠাকুরের মাটি-চরণামৃত রাখার জন্যও ওই স্থানটি বেছে নেওয়া হয়। বলাবাহুল্য, তুলসীমঞ্চের গঠন এবং ওই খোপ অনেক বড় ও চারধার উন্মুক্ত রেখে; ওই গর্ভগৃহে তুলসীদেবীকে প্রতিষ্ঠিত করার দৃষ্টান্তও লক্ষণীয়। সেক্ষেত্রে তুলসীমঞ্চটির উপরিভাগ মন্দিরের চেহারা নেয়। এ ধরনের তুলসীমঞ্চগুলি টেরাকোটা মন্দিরের সমগোত্রীয়।

বাংলায় প্রচলিত ছোটো ছোটো তুলসীমঞ্চগুলিও পোড়ামাটির। রোদে শুকিয়ে 'বণক'-এর প্রলেপ লাগিয়ে পণে পোড়ানো হয়। তারপর মাটিতে কিংবা চৌকো উঁচু বেদী প্রস্তুত করে তুলসীমঞ্চটিকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। মঞ্চের চারপাশটি আলপনা চিত্রিত। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে বৈশাখের সংক্রান্তি পর্যন্ত তুলসীমঞ্চের দু' পাশে বাঁশ বেঁধে দু-প্রান্তে দড়ি বেঁধে ছোট ছিদ্র যুক্ত একটি হাঁড়ি ঝোলানো হয়; যাতে ওই ছিদ্র পথে বেরিয়ে আসা বিন্দু-বিন্দু জল তুলসীগাছের উপর পড়ে। তুলসীগাছ সংরক্ষণে এ এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। ধর্মীয় মোড়কে প্রেমের প্রতীক বা তুলসীর ভেষজ বস্তুগুলিকে রক্ষা করা। নদীমাতৃক পলির দেশে পোড়ামাটির শিল্প বস্তু নির্মাণ করে তুলসীদেবীকে লৌকিক সমাজ একটা নির্দিষ্ট মঞ্চ দিল। বলাবাহুল্য, মাটিতে গর্ত করে তাকে পাত্র হিসাবে ব্যবহার কৌশল থেকেই মাটির পাত্রের ধারণা। তুলসীমঞ্চ নির্মাণ করেন এরকম শিল্পীদের কেউ কেউ নিজেদেরকে রাজমিস্ত্রিও বলেছেন। যাইহোক, প্রাচীন গ্রিসে রাজকীয় উৎসবেও তুলসী ব্যবহৃত হতো। মোন্ডাভিয়াতে বাউন্ডুলে প্রেমিকের জীবনকে বাঁধতে প্রেমিকা তার হাতে তুলে দেন সমঞ্জরী তুলসী। তুলসী অক্সিজেনের শক্তি ঘর। পুণ্যিপুকুর, কুলকুলতি, বসুন্ধরা ব্রতের সময় মেয়েরা এই শক্তিঘরকে নিরাপদ এবং পবিত্র স্থান হিসাবেই বেছে নিয়েছেন। কখনো কখনো মঞ্চটিকে ঘিরে তিন ধারে সেজে ওঠে ফুলের বাগান। গ্রাম্য পরিবেশে তুলসীমঞ্চের পাশাপাশি থাকে ধানের মোড়াই এবং বেশ দূরে হাঁস ঘর। আরও একটু দূরে গোয়ালঘর এবং খামার ও সারকুল। কিন্তু মাটির তুলসীমঞ্চ প্রায় হারিয়ে গেছে। যদিও তুলসীমঞ্চ এখনও আছে। ■

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত

চার্লস এইচ. টাউনিস : (১৯১৫-২০১৫)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন আমেরিকার অন্যতম নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানী। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাডার বোমা বিস্ফোরণের বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন। তিনি 'মেসার' এবং 'লেসারের' আবিষ্কর্তাও ছিলেন। তাঁর অন্য বিষয়গুলির মধ্যে বিশিষ্ট অবদানগুলি হলো, মাইক্রওয়েড স্পেক্টোস্কপি, কোয়ান্টাম ইলেকট্রনিক্স, রেডিও এবং ইনফ্রারেড জ্যোতির্বিজ্ঞান।

উদ্ধৃতি : ভারতীয় ছাত্রদের উচিত ধর্মীয় সংস্কৃতির গুরুত্ব মান্য করা। কারণ সনাতন হিন্দুধর্ম শাস্ত্রের মধ্যেই জীবনের অর্থ ও মূল্যবোধ বিধৃত আছে। বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণাকে আলাদা করা হানিকর। আমি মনে করি, বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার দ্বন্দ্ব বাস্তব সম্মত নয়।

উৎস : ইন্টারভিউস অব নোবেল লরিয়েট্স অ্যান্ড এমিনেন্ট স্কলারস্— টি.ডি.সিং অ্যান্ড পবন. কে. সাহারন।

সি. ই. এম. জোভ : (১৮৯১-১৯৫৩)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন বিখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক এবং চিন্তাবিদ। ১৯৪০-এর দশকে ব্রিটিশ রেডিয়ো-তে তিনি নিয়মিত ভাষ্যকার ছিলেন। তিনি ৭৫টি পুস্তক রচনা করেন।

উদ্ধৃতি : উপনিষদের শিক্ষাপদ্ধতি ছিল মুক্ত এবং সাহসী। তার সাধারণ সিদ্ধান্ত ছিল, আত্মজ্ঞান লাভই হচ্ছে বাস্তব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

উৎস : হিন্দুইজম ইনভেডস্ আমেরিকা— অয়েন্ডেল থমাস।

প্রফেসর আর্থার হোম্স : (১৮৯০-১৯৬৫)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের অন্যতম ভূবিজ্ঞানী। তিনিই প্রথম ইউরেনিয়াম-লেড দ্বারা রেডিয়োমেট্রিক সময় নির্ধারণের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তাঁর বিখ্যাত পুস্তকটির নাম, 'প্রিন্সিপালস অব ফিজিক্যাল জিওলজি'। তিনি প্রাচীন ভারতীয় প্রজ্ঞার দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

উদ্ধৃতি : প্রাচীন কালে পণ্ডিতরা পৃথিবীর এবং ভূমণ্ডলের আয়ুর বিশেষ ও বিস্তৃত সময় সারণীর উল্লেখ করেছিলেন। আর সব থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, অতিলৌকিক এবং অসাধারণ যুগ সারণী ছিল প্রাচীন হিন্দু ঋষিদের। বর্তমান বিজ্ঞানীদের পৃথিবীর বয়স নির্ধারণের প্রবল আকাঙ্ক্ষার বহুপূর্বে প্রাচীন ঋষিরা মহাজাগতিক সময়কালের বিস্তৃত সারণীর বর্ণনা করেছেন।

উৎস : হিন্দুইজম অ্যান্ড সাইন্টিফিক কোয়েস্ট—টি. আর. আয়েঙ্গার।

প্রফেসর কাকুজো ওকাকুরা : (১৮৬২-১৯১৩)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন জাপানের অন্যতম দার্শনিক, চিত্রকুশলী, লেখক এবং চিত্রশালার তত্ত্বাবধায়ক। তাঁর লেখা বিশ্ববিখ্যাত পুস্তকটি হলো, 'দ্য বুক অব টি'। তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আক্রমণের বিরুদ্ধে জাপানকে প্রাচ্যসভ্যতার সদস্য হিসাবে ধরেছিলেন।

উদ্ধৃতি : আমরা ভারতের বিজ্ঞান-গঙ্গার সঙ্গে পরিচিত আছি যেটা কোনওদিনও স্রোতহীন হয়ে যায়নি। ভারত তার প্রজ্ঞা-মুক্তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিল। বুদ্ধের পূর্বের সময়েই ভারত কপিলের সাংখ্যদর্শন এবং পারমাণবিক তত্ত্বের আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল।

উৎস : দ্য আইডিয়াল্স অব দ্য ইস্ট উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু দ্য আর্টস অব জাপান—কাকুজো ওকাকুরা।

অ্যানি উড বেসান্ট : (১৮৪৭-১৯৩৩)

পরিচিতি : তিনি ছিলেন লন্ডনের আইরিশ মহিলা লেখক, নারীমুক্তির পথ প্রদর্শক, সাম্যবাদী, বক্তা এবং ধর্মতত্ত্ববিদ বিদুষী নারী। তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে' যোগদান করেন এবং তার সভাপতি হন ১৯১৭ সালে।

উদ্ধৃতি : আমি গত ৪০ বৎসর ধরে পড়াশুনা করে বুঝেছি, সারা পৃথিবীতে এত বিশুদ্ধ, এত সম্পূর্ণ, এত বিজ্ঞান সম্মত, এত জ্ঞানগর্ভ এবং এত ধর্মীয় চেতনাযুক্ত যদি কোনও এক ধর্ম থেকে থাকে, তা হলো একমাত্র হিন্দুধর্ম।

উৎস : ইন্ডিয়া এসেস অ্যান্ড লেকচারস—খণ্ড ৪-অ্যানি উড বেসান্ট।

উদ্ধৃতি : ভারত হচ্ছে সমস্ত ধর্মের জননী। বিজ্ঞান আর ধর্ম সেখানে এক আশ্চর্য ঐক্যসূত্রে বাঁধা আছে। আবার একদিন ভারতই পৃথিবীতে সমস্ত ধর্মের জননীর ভূমিকা পালন করবে।

উৎস : হিন্দু সুপিরিওরিটি— হর বিলাস সারদা।

(লেখক ও সংকলক : সলিল গেঁউলি।
সম্পাদনা : ড. এ ভি মুরলী,
নাসার প্রাক্তন বৈজ্ঞানিক।)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

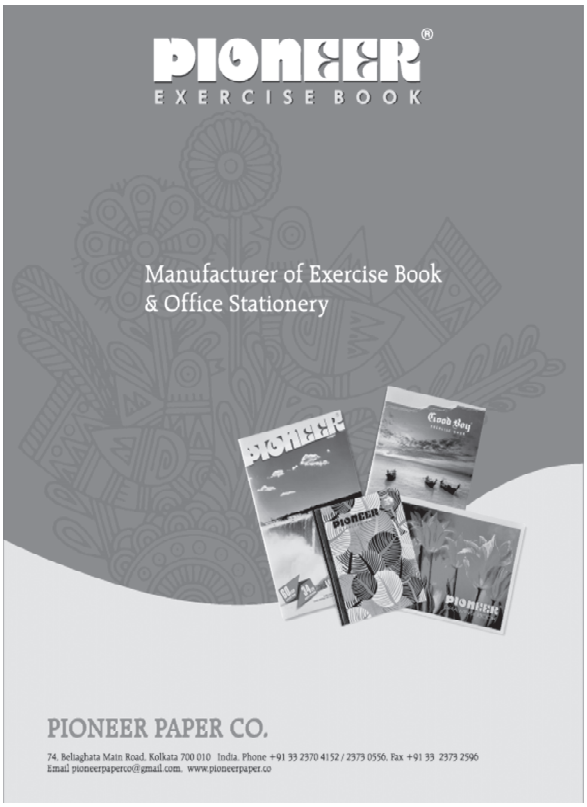

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

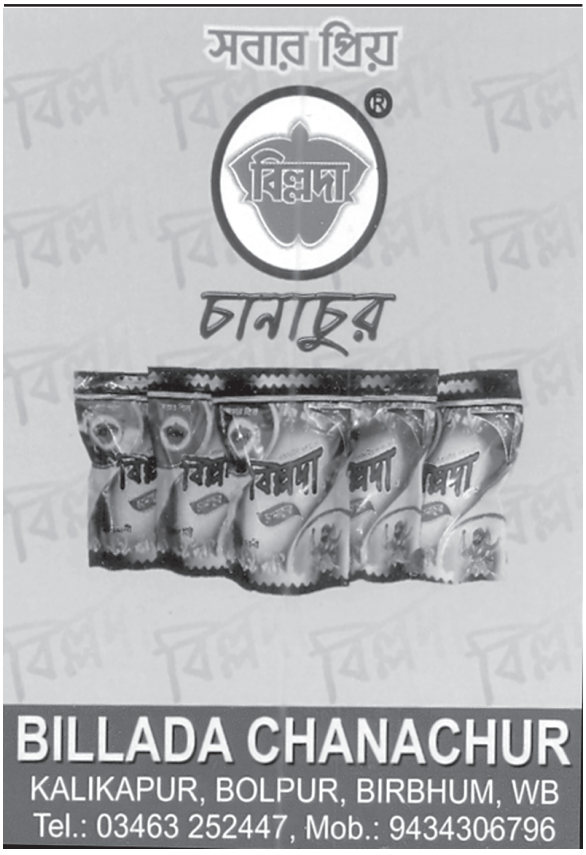

সারা অ্যাঞ্জেলিয়া

সুবীরকুমার প্রামাণিক

'কী সুন্দর দেখতে এই স্মৃতিসৌধ বল। বছরের পর বছর দেশ-বিদেশের মানুষ দেখছে। শাজাহান তাঁর স্ত্রী মমতাজকে কতো ভালোবাসতেন বল। এমন ভালোবাসার নজির খুব কমই মেলে।' ইতি রায় তার স্বামী সবিনয়কে বললেন।

সবিনয় ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে বললেন, 'এমন ভালোবাসার নজির না থাকাই ভালো। পৃথিবীর মানুষ জানল শাজাহান তাজমহল নির্মাণ করেছেন। আসলে কি তাই? যে শিল্পীরা পাথর কেটে কেটে এই সৌধ বানাল তাদের খোঁজ কেউ কি রেখেছে? তারা যাতে দ্বিতীয় কোনও স্থাপত্য এমন সুন্দরভাবে স্থাপন করতে না পারে তার ব্যবস্থাও শাজাহান করেছিলেন। তাদের চোখের জলের দাম কেউ দিল না।'

'তুমি চুপ কর। তুমি আমার জন্য ভালোবাসার ছোটখাটো কোনও নজির স্থাপন করতে পারবে! তোমার দৌড় দেখা গেছে। ব্যবসায়ী মানুষ, হিসাব করে চলো।'

'আমি যদি কিছু করি তাহলে একটা স্কুলবিল্ডিং বানিয়ে দেব। কত ছেলেমেয়ে, কত পরিবার তাতে উপকৃত হবে। আগে বিনীতা কলেজ সার্ভিসটায় জয়েন করুক।'

'আহ্ বাপি। তোমরা বেড়াতে এসে ঝগড়াঝাটি করবে! একটু চুপ করো। ভিজিটাররা হাসাহাসি করবে।' বলেই বিনীতা তার নোট বুকে নোট করছিল। জিওগ্র্যাফির ছাত্রী। স্টুডেন্ট লাইফে এক্সকারশানে এসেছিল। মার্বেল পাথরের কোনও ক্ষতি হচ্ছে কিনা কিংবা কোনও সংস্কার হচ্ছে কিনা সেইসব তথ্য লিখছিল সে।

'ইউ আর বেঙ্গলি। আই মিন বাঙালি পড়িবাড়।'

বিনীতা দেখল দুধে আলতা রঙের এক মেম তাকে প্রশ্নটা করছে। লাল টপ পরা। ঘাড় অবধি কোঁকড়ানো ব্রাউন চুল। চোখের মণি নীলাভ। পায়ে কালো রঙের স্যান্ডেল। পিঠে ঝোলা ব্যাগ। হাতে দামি ক্যামেরা নিয়ে শুট করছে।

বিনীত বলল, 'আর ইউ...'

'আই অ্যাম আমেরিকান। কাম ফ্রম মাই স্টেট ইন্ডিয়ানা ইন ইউনাইটেড স্টেটস্। মাই নেম ইজ সারা অ্যাঞ্জেলিয়া।'

বিনীতা হাত জোড় করে বলে, 'কনগ্র্যাচুলেশন সারা। আই অ্যাম বিনীতা রায়। আর ইউ মিস অর মিসেস?'

'মিস।' ঠোঁটে অনাবিল হাসি ছড়িয়ে বলল সারা।

'মাই পেরেন্টস।' বিনীতা বাবা মাকে দেখিয়ে বলল।

'ইওর পেরেন্টস।' হাত জোড় করেই সবিনয়কে বলল, 'ফাদার'। ইতিকে দেখে বলল, 'মাদার, কনগ্র্যাচুলেশন এভরিবডি।'

ইতি কেমন যেন নাক সিঁটকে রইলেন। কোথাকার অসভ্য মেয়েরে বাবা! হাঁটুর ওপরে জামা। বাংলা জানে না। মেয়েকে বললেন, 'চল খুকু। অন্যদিকে যাই—'

'পেরেন্টস অ্যান্ড সিস্টার' বলেই সবিনয় ও ইতির মাঝখানে বিনীতাকে দাঁড় করিয়ে ফটো তুলল সারা। ওদের পাশে এবং বিনীতার পাশে আলাদাভাবে দাঁড়িয়ে সেলফি তুলল বিভিন্ন পোজে।

সবিনয় বললেন, 'দেখ ইতি। এ কেমন একাই ইন্ডিয়াতে বেড়াতে এসেছে। আমেরিকা থেকে। এরা কত মডার্ন। কতই বা বয়স। বড় জোর আমাদের বিনীতার মতো হবে। সাতাশ কী আঠাশ। আর তুমি এখনও তোমার মেয়েকে খুকু করেই রাখলে। এখনও একা একা ওকে কোথাও ছাড়লে না। বিয়ের পর তুমি কী করবে।'

ইতি বললেন, 'ওকে সেই কেজি স্কুল থেকে নিয়ে যাচ্ছি আমি। আজকাল রাস্তাঘাটে কত লোফার ছেলে ঘোরে— তা কি জানো মেয়ের বাপ হয়ে? আমি ওর মা। আমি সব বুঝতে পারি।'

ক্যামেরাটা বিনীতাকে দিয়ে ফোটো শুট করতে বলল সারা। বিভিন্ন পজিশনে ছবি তোলার জন্যে সারা দাঁড়াল বিনীতার বাবা মাকে সঙ্গে নিয়ে। সহজ সরল বিদেশিনীকে ভালো লেগে গেল বিনীতা ও তার বাবার। মা ঠিক ঠিক ভাবে মেনে নিতে পারছিলেন না। তবে অচেনা কাউকে কত সহজেই ফাদার, মাদার, সিস্টার বলল। এটা মনে লেগেছে ইতির।

'আই উইল লার্ন বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ। বিনীটা ইউ আর মাই বেঙ্গলি ম্যাডাম। আই গো টু ইওর হাউস। স্টে অ্যাজ এ পেয়িং গেস্ট।'

'নো পেয়িং গেস্ট। গেস্ট।' উভয়েই হেসে উঠল।

একটা হোটেলে উঠল ওরা চারজন। চাইনিজ খাবার খেল প্রত্যেকেই। খেতে খেতে ইতি বলল, 'আমার মেয়ে তো গোটা গা ঢাকা পোশাক পরেছে। তোমার এতো অল্প পোশাক কেন?'

বাংলা ঠিক বুঝতে পারল না সারা। সে বিনীতার দিকে তাকাল। বিনীতা মাথা নাড়ল ডাইনে-বায়ে। মাকে বলল, 'মা ওটা ওদের দেশের পোশাক।'

খাওয়ার শেষে সারা বিল মেটাল। বাধা দিলে ইতির হাত ধরে বলল, 'মাদার।'

ইতির মাথা থেকে বরফ গলতে শুরু করল। 'মাদার' ডাক খুব মধুর শোনাল। কিছুক্ষণ থাকার পর বললেন, 'ডটার।'

আরিব্বাস ইংরেজিতে বললেন দেখে সবিনয় ও বিনীতা মুখ টিপে হাসল।

'আই হ্যাভ নো পেরেন্টস—স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট-ডেথ।' সারার চোখে মুক্তোর মতো গড়িয়ে পড়ল অশ্রু।

বিনীতা তার মাকে বলল, 'মা। সারার বাবা-মা পথ দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। কথাটা শুনে আঁতকে উঠলেন ইতি! বুকের ভেতর দিয়ে একটা শীতল বাতাস বয়ে গেল। তিনি ভাঙলেন। বললেন, 'আহারে!' বলেই আঁচল দিয়ে সারার চোখের জল মুছে দিলেন। সারা মাতৃস্নেহে আপ্লুত হয়ে জড়িয়ে ধরল ইতিকে। ইতিও ওর বাদামি চুলে স্নেহের পরশ দিলেন হাত দিয়ে। বললেন, 'তুমি আমার আর এক ডটার।'

বিনীতা স্মার্ট ফোনে ফোটো তুলে রাখল। বিনীতার কানে কানে সবিনয় বললেন, 'তোর মা পারে বটে।' উভয়েই হাসল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভিজিট করতে আসা সারা অ্যাঞ্জেলিয়া বিনীতার বাড়িতে থাকে বীরশিবপুরে। বাংলা শিখছে দিনরাত। বাঙালি রান্নাবান্না শিখছে বিনীতার মায়ের কাছে। গ্রাম-বাংলায় ঘুরছে। বিনীতার স্কুটিতে চেপে এদিক-ওদিক ঘুরছে। শাড়ি পরা শিখেছে। চুড়িদারের ওপর।

চানামুড়ি খেতে খুব ভালো লাগছে সারার। খুব টেস্টি বলে মনে হয়। চা খেতে খেতে ইতি বললেন, 'চুড়িদারের ওপর নয়। সায়া ব্লাউজসহ শাড়ি পরবে তুমি। আমি নিজে হাতে পরিয়ে দেব। আর তোমার নাম অ্যাঞ্জে— ওসব বলতে পারব না। আমি তোমাকে বিনীতার দিদি অঞ্জু বলেই ডাকব। আন্ডারস্ট্যান্ড?'

'—আন্ডারস্ট্যান্ড মাদার।'

ইতি সাদা গোলাপ ছাপ কালো শাড়ি পরিয়ে দিলেন সারাকে। বললেন, 'কোমরে গিট বেঁধে দিচ্ছি। আর খুলে যাবে না সেদিনের মতো। দুর্গাপুজোয় সিঁদুর খেলতে হবে।

'আমি অঞ্জুদিকে নিয়ে ধুনুচি নাচ নাচব।' বিনীতা বলল।

স্কুটিতে চেপে ওরা বের হলো। ফিট ফর্সা সারার চেহারা। কালোরঙের শাড়িতে আরও ফুটে উঠেছে। পথচারীরা তো হাঁ করে তাকিয়েই রইল। কেউবা অন্যমনস্ক হয়ে ধাক্কা মারল একে অপরকে।

একদিন সারা স্কুটি চালাল বিনীতাকে নিয়ে। কত রোমিও ওদের ফলো করে গাড্ডায় পড়ে গেল। ওভারটেক করতে গিয়ে।

দেবীর বোধন শুরু হয়ে গেল। ষষ্ঠীর দিন। সারা শাড়ি ছাড়া অন্য পোশাক পরে মণ্ডপে গেল না। সপ্তমীর দিন কাটা কাটা বাংলায় মন্ত্র বলল। বিনীতা ও তার দুই বান্ধবী দোলন-অনুরূপার সঙ্গে। বেশ মজা লাগল ওদের সঙ্গে তালপাতার চামচে কলাপাতায় ঘুগনি খেতে। ফুচকা খেল।

অষ্টমীর দিন সারার লুচি বেলা দেখে হেসে লুটোপুটি সবাই। লুচি যেন ভারতের মানচিত্র হয়ে যাচ্ছে। বিনীতা পরেছে চুড়িদার। দোলন জিনসের প্যান্ট। অনুরূপা লেহেঙ্গা আর সারা শাড়ি। ওরা সন্ধ্যের সময় পুজোমণ্ডপে গেল। একটু অনুশীলন করার পর সারা ঢাক বাজাতে শুরু করে দিল। তিন বান্ধবী কাঁসি বাজাতেও পারল না। ঝিনুকের ঠাকুর হয়েছে। দর্শনার্থীরা ঠাকুর দেখতে এসে এক বিদেশিনীর শাড়ি পরে ঢাক বাজানো দেখল তারিয়ে তারিয়ে।

নবমীর দিন কুমারী পুজো দেখে মন গলে গেল সারার। পাঁঠাবলি দেখে প্রথমটা আঁতকে উঠলেও মানিয়ে নিল ধীরে ধীরে। ধুনুচি নাচ দেখে দেখে নাচতে শুরু করলেও ধুনুচিটা সাহস করে ওল্টাতে পারল না। অন্যদের মতো। সেলফি তুলল কয়েকটা।

বিজয়ার দিন সিঁদুর খেলল। গরদের শাড়ি পরে। তার মুখ সিঁদূরে লালে লাল হয়ে গেল। অন্যদের দু'গালে মাখিয়ে দিল। অনেকের মোবাইল বন্দি হলো এই দৃশ্য। কোমর দুলিয়ে সারা নাচল, 'ঢাকের তালে কোমরে দোলে'— কয়েকটি লোফার ছেলে নেশাগ্রস্ত হয়ে সারার কোমর ধরতে চাইল। কেউবা হাত ধরে টান দিল। সারার আঁচল টেনে ধরল কেউ।

সারা বলল, 'ইডিয়েট। ননসেন্স।'

বিনীতা, অনুরূপা ও দোলন সমবয়সী। তারা ক্যারাটে শিখেছিল। অ্যাকশন শুরু হলো। মেয়েদের হাতে মার খাওয়া অচেনা ছেলেগুলোকে তুলে নিয়ে গেল সিভিক ভলেন্টিয়াররা। হৈ চৈ পড়ে গেল।

'সারাদি এরা হলো ভারতীয় সভ্যতার কুলাঙ্গার। এদের জন্যই সংস্কৃতির সুনাম নষ্ট হচ্ছে।' অনুরূপা বলল। দোলন সারার হাত ধরে বলল, 'এক্সকিউজ মি।'

সারা বলল, 'ভালো মানুষের সঙ্গে দু'চারটে গুন্ডা বডমাস ঠাকবে। ডোন্ট ওরি।'

দশমীর পরদিন সারা অ্যাঞ্জেলিয়া বিনীতাদের বাড়ি ছাড়ার আগে পায়ে হাত দিয়ে বিনীতার বাবা মাকে প্রণাম করল।

বিনীতা হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত সারাকে তুলে দিতে গেল। চোখ ছলছল করে সারা বলল, 'মা। আপনার ডেওয়া চারডে শাড়ি নিয়ে গেলাম সঙ্গে করে। মায়ের স্মৃটি ভুলব না।'

ইতি জড়িয়ে ধরে সারার কপালে চুমু খেয়ে বললেন, 'আবার আসিস মা। যখনই মন চাইবে ঠিকানা তো নেওয়া আছে। চলে আসবি। তুই এলে ছোটবেলায় হারিয়ে যাওয়া আমার বড় মেয়েকে আবার ফিরে পাব মা। তোর মধ্যে দিয়েই।'

সবিনয় হাত নেড়ে বিদায় জানালেন। দেখলেন বিনীতার মায়ের দেওয়া সোনার রিং দুটো সারার কানে কেমন জ্বলজ্বল করছে। নিজের চোখ দুটো কেমন ঝাপসা হয়ে এলো। আর কিছুই দেখতে পেলেন না তিনি।

সারা আর বিনীতা উভয়েই হাত নেড়ে বিদায় জানাল। ▮

ময়ূর-ময়ূরীর কথা

সে অনেক দিন আগেকার কথা। আচিক দেশে একজন খুব ধনী ব্যক্তি ছিল। তিনি খুব ভালো মনের মানুষ ছিলেন। তাঁর একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটির যখন বিয়ের বয়স হলো তখন তার জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করা শুরু হলো। বিভিন্ন দেশ থেকে নানান পাত্রের সন্ধান এল। শেষে আচিক প্রদেশের এক যুবকের সঙ্গেই তার বিয়ের কথা স্থির হলো। সচ্ছল ঘরেই তার মেয়ের বিয়ে হবে— একথা ভেবে খুব আনন্দ পেল সেই ব্যক্তি।

বিয়েতে মহা ধুমধাম আয়োজন করা হলো। সেই বিয়েতে একজন রাজপুরোহিত এলেন রাজার কাছ থেকে ভেট বা উপহার নিয়ে।

রাজার দেওয়া সেই উপহারের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি মেয়েটির জন্য একটি বিশেষ পাটের শাড়ি পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু শাড়িটির মাহাত্ম্য হলো যে, শাড়িটি পরার সময় একটা মন্ত্র বলে পরতে হবে। তাহলে শাড়িটি সোনার অলংকারের মতনই দেখতে লাগবে।

কিন্তু শাড়িটিতে মন্ত্র না বলে হাত দিলে তার চরম ক্ষতি হয়ে যাবে। রাজপুরোহিত সমস্ত কথাই মেয়েটিকে আর তার স্বামীকে বারবার সতর্ক করে বলে দিয়েছিল।

বিয়ের পর বেশ মজাতেই তাদের দিন কাটছিল। ধনী ঘরের মেয়ে হলেও সে সব কাজই করতে পারে। মাছ ধরা থেকে শুরু করে ধান বোনা সব কাজই সে করত। তাদের দিন বেশ সুন্দর আর আনন্দে কাটছিল।

বেশ কিছু বছর পরে তাদের একটি পুত্র সন্তান হলো। আবার তার কয়েক মাস পরেই মেয়েটির বাবা ও মা এক সঙ্গে মারা গেলেন। তখন সমস্ত ধন সম্পত্তিই মেয়েটির হয়ে গেল।

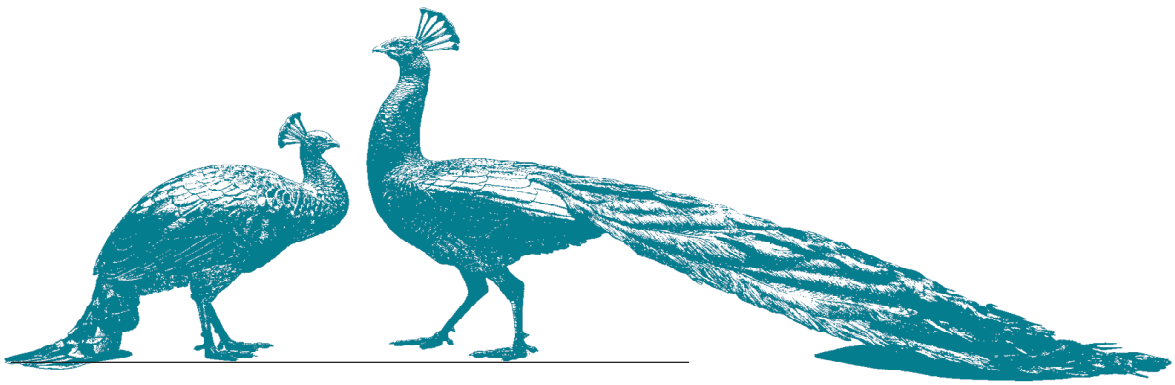

তবু মেয়েটি নিজেই সমস্ত কাজ করত। মাঠের কাজ, রান্না করা , ঘরের কাজ সব কাজ সে নিজেই করত। কিন্তু এত বছরেও মেয়েটি এই মন্ত্রপূত শাড়িটিতে একবারের জন্যও হাত দেয়নি। পরেওনি শাড়িটি।

একদিন সকালে সুন্দর ঝলমলে রোদ উঠেছে। মেয়েটি ভাবল, এমন সুন্দর রোদ তো আর সচরাচর পাওয়া যায় না, সমস্ত শাড়ি জামাকাপড় রোদে দিই। বহুদিন দেওয়া হয়নি। রোদে দিলে বেশ ভালো থাকবে।

এই ভেবে সে সেই মন্ত্রপূত শাড়িটিও রোদে দিল আর তার স্বামীকে বলল, আমি কাছেই মাঠে ধান বুনতে যাচ্ছি। যদি বৃষ্টি নামে আমি এসে শাড়িটি তুলব, তুমি শাড়িটিতে হাত দেবে না। কারণ তুমি শাড়িতে হাত দেওয়ার মন্ত্র জান না। তুমি হাত দিলে কোনও অঘটন ঘটতে পারে। স্বামী তার কথায় সায় দিল।

তারপর মেয়েটি ধান বুনতে মাঠে চলে গেল। কিছু সময় পরে অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামল। স্বামী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। কিন্তু মেয়েটির আসতে দেরি হওয়ায় সে ভাবল শাড়িটি তুলে রাখলে কী আর এমন ক্ষতি হবে। এই ভেবে সে শাড়িটিতে হাত দিল। সে তো মন্ত্র জানত না। তাই সঙ্গে সঙ্গে সে একটা বড়ো পাখি হয়ে গেল আর শাড়িটি তার গায়ে জড়িয়ে গেল। ঠিক তখনই মেয়েটি এসে পড়েছে। বলে উঠল, 'এ কী করলে, এ কী করলে? এ যে সর্বনাশ হয়ে গেল।' বলতে বলতে সে মন্ত্র না বলেই ছাড়ানোর জন্য শাড়িতে হাত দিয়ে ফেলল। আর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিও একটি বড়ো পাখি হয়ে গেল। কিন্তু তার গায়ে শাড়ি জড়িয়ে গেল না।

এই ছেলে ও মেয়েটিই হলো ময়ূর ও ময়ূরী। ময়ূরীর থেকে ময়ূর অনেক বেশি সুন্দর। আচিক প্রদেশের মানুষ মনে করেন ওই শাড়িটি জড়িয়ে রয়েছে ময়ূরের গায়ে।

আজও আচিক প্রদেশের মানুষজন বিশ্বাস করে যে, বৃষ্টি পড়লে ময়ূর ও ময়ূরী যে চিৎকার করে সেটা সেই ঘটনারই রেশ। মেয়েটির স্বামী শাড়িতে হাত দেওয়ার জন্য পাখি হয়ে যাওয়ায় মেয়েটি দুঃখে চিৎকার করে কাঁদছিল। আচিক প্রদেশের মানুষ মনে করে আজও ময়ূর-ময়ূরী বৃষ্টির সময়ে চিৎকার করে কেঁদে তাদের দুঃখের কথা বলে।

আকাশ দেববর্মণ

ভারতের পথে পথে

রত্নগিরি

ওড়িশায় উদয়গিরি থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে কেলুয়া নদীর তীরে গুপ্ত আমলের রত্নগিরি। এখানকার পাহাড়চূড়োয় খননে আবিষ্কৃত হয়েছে মনোরম স্তূপ,স্তূপের নীচে অনুপম শিল্পসুষমা মণ্ডিত চতুর্ভুজাকার সপ্তম শতকের দু'টি মনাস্ট্রি, আটটি মন্দির, ভিক্ষুদের আবাসকক্ষ, অসংখ্য ছোটো বড়ো স্তূপ এবং ভাস্কর্যের নানান নিদর্শন। একটি মনাস্ট্রি ৬০টি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে। কারুকার্যমণ্ডিত নীলাভ সবুজ রংয়ের ক্লোরাইট পাথরের তোরণদ্বার। তিনশোর বেশি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে। পাশেই কৃষ্ণমন্দির। রত্নগিরি পাঁচ থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত হীনযানী বৌদ্ধ দর্শনের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। হিউয়েন সাঙের বিবরণে উল্লিখিত পুষ্পগিরি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এই রত্নগিরিতে।

জানো কি?

- নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা ভরতমুনি।
- কুষাণযুগের দু'জন চিকিৎসক চরক ও সুশ্রুত।
- শূন্যবাদের প্রবর্তক নাগার্জুন।
- কুষাণযুগে গান্ধার ও মথুরা শিল্পরীতির উদ্ভব হয়।
- গান্ধার শিল্পরীতি প্রথম কনিষ্কের আমলে বিকশিত হয়।
- মহাবিভাষ্য রচনা করেন বসুমিত্র।
- বুদ্ধচরিত, সৌন্দরনন্দ, বজ্রসূচি, সারিপুত্তপ্রকরণ গ্রন্থগুলির রচয়িতা অশ্বঘোষ।

ভালো কথা

স্বচ্ছ পাড়া অভিযান

সেদিন বিকেলে আমি আমাদের ক্লাবঘরে টিন টিন পড়ছিলাম। বঙ্কু, বুকাই, তিতলিরাও অন্য বই নিয়ে পড়ছিল। বড়োরা সবাই এসে জমা হচ্ছিল। তিতলির জ্যেঠু ঢুকেই বলতে শুরু করলেন— কী লজ্জা। ভদ্রেশ্বর, বাঁকুড়া, চাঁপদানি, বাঁশবেড়িয়া, বৈদ্যবাটি, পানিহাটি,দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, শ্রীরামপুর, মধ্যমগ্রাম, উত্তর ব্যারাকপুর! যেখানে সেখানে নোংরা ফেলে ফেলে নোংরা শহরের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। আমারা ধূপগুড়ির মানুষও কম নোংরা নই। আমি সব ক্লাবের সঙ্গে কথা বলেছি তারা নিজের নিজের পাড়ার পরিচ্ছন্নতার দিকটা দেখবে। আমাদের পাড়ার দায়িত্ব আমাদের। ছোটোরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে আসবে শুধু জমাদারের গাড়ি যখন আসবে, তাতেই ময়লা দিতে হবে। আমরা মহা উৎসাহে কাজ শুরু করে দিয়েছি। এখন আমাদের পাড়া ঝকঝকে তকতকে।

শুভম বসাক, সপ্তমশ্রেণী, মিলপাড়া, ধূপগুড়ি,জলপাইগুড়ি।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

তুমি বৃষ্টি

নিলাদ্রি বেরা, দ্বাদশ শ্রেণী, এগরা, পূঃ মেদিনীপুর।

সবাই চাইছিল তোমাকে,
না পেয়ে রেগেও যাচ্ছিল,
তুমি আসবো আসবো করেও আসছিলে না,
লুকোচুরি খেলছিলে তুমি,
সোশ্যাল মিডিয়াতে তোমাকে নিয়ে ব্যঙ্গ চলছিল।
তোমার আশা অনেকে ছেড়েই দিয়েছিল
অবশেষে তুমি এলে কিন্তু খুব রেগে গিয়ে।
বেশ কয়েকটি প্রাণ তুমি নিলে
তারপর শীতল করলে ধরিত্রী,
তুমি অনাসৃষ্টি, তুমি বৃষ্টি।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা ।। অভিমন্যু ।। ১৬

বীর অভিমন্যুর সামনে কেউ দাঁড়াতে পারে না।

অভিমন্যু চক্রব্যূহ ভেদ করে দ্রোণের সামনে পৌঁছায়।

কিন্তু হায়! পাণ্ডবেরা তাঁর কাছে পৌঁছবার আগেই জয়দ্রথর কৌশলে ব্যূহমুখ বন্ধ হয়ে যায়।

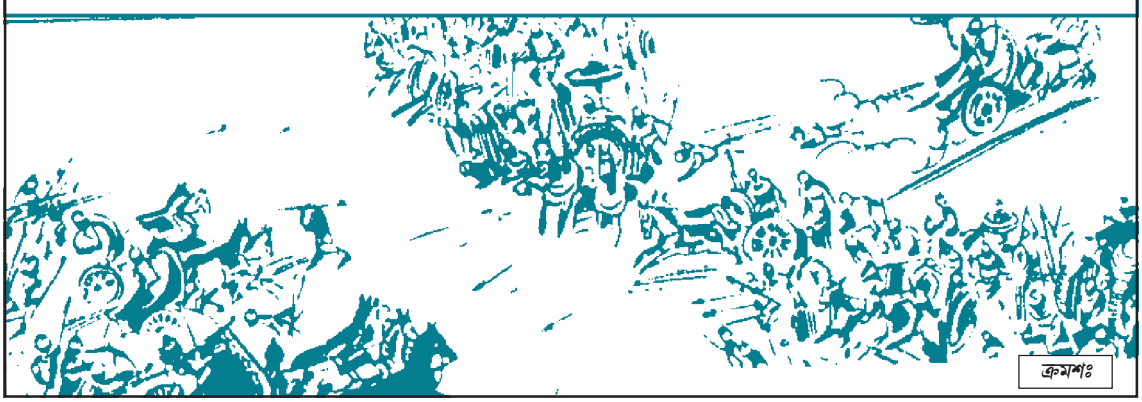

স্বাধীনতা দিবসে অক্ষয়ের উপহার গোল্ড

অনন্যা চক্রবর্তী

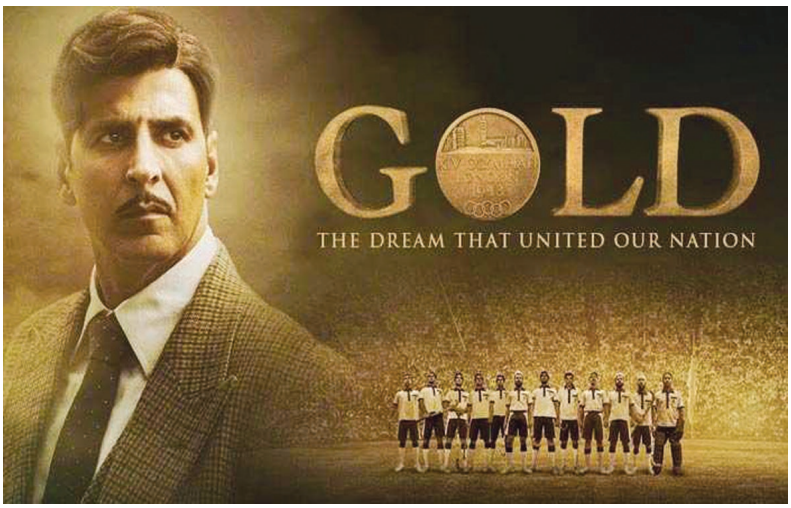

অক্ষয়কুমার পেশাদার অভিনেতা। বাজারের কথা মাথায় রেখে তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কিন্তু তাঁর মন যে বাজারের দাসত্ব করে না, সে প্রমাণ অনেকবার পাওয়া গেছে। সলমন খাঁন এখনও ছবি রিলিজের ক্ষেত্রে ইদ বা মহরমের মতো ইসলামি পরব পছন্দ করেন। সম্ভবত মুসলমান বিরাদরিকে উসকে দেবার জন্যই এই ব্যবস্থা। কিন্তু অক্ষয় অন্য ধাতুতে গড়া। ছবি রিলিজের ক্ষেত্রে তাঁর পছন্দ ১৫ আগস্ট, ২৬ জানুয়ারির মতো দিনগুলি। ইদানীং শুধু বক্স অফিস নয়, দেশের মানুষকে স্পষ্ট কিছু বার্তা দেবার জন্য অক্ষয় ছবি করছেন। হালের টয়লেট এক প্রেমকথা, প্যাডম্যান তার প্রমাণ। এই ধরনের ছবির বিষয়বস্তুই বলে দেয়, বলিউডি তারকা হলেও অক্ষয়কুমার দেশের সরকার এবং নাগরিক সমাজের সাফল্যকে সিনেমার মাধ্যমে তুলে ধরতে চান। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। ২০১৮-র ১৫ আগস্ট তাঁর উপহার 'গোল্ড'।

'গোল্ড' টয়লেট এক প্রেমকথা বা প্যাডম্যানের সমগোত্রীয় নয়। এই ছবিকে বায়োপিকও বলা যেতে পারে। ১৯৪৮-এর লন্ডন অলিম্পিকে সোনাজয়ী ভারতীয় হকিদলের অধিনায়ক কিষনলাল এই ছবির অনুপ্রেরণা। চল্লিশের দশকে ভারতীয় হকিদলকে ঘিরে জনমানসে যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল তার এক সুচারু চিত্ররূপ পরিস্ফুট হয়েছে গোল্ডের ট্রেলারে। ছবিতে অক্ষয়কুমার হকিদলের কোচ তপন দাসের ভূমিকায়। চরিত্রটি তৈরি হয়েছে কিষনলালের আদলে।

বিপক্ষ দলের হৃৎকম্প ধরিয়ে দেওয়া রাইট উইঙ্গার কিষনলালের জীবন নাটকীয় উপাদানে ভরপুর। স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পর ১৯৪৮ সালে লন্ডন অলিম্পিকে ভারতীয় হকিদলকে নেতৃত্ব দিলেও ছোটোবেলায় কিষনলাল মোটেই হকির প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। জন্ম (২ ফেব্রুয়ারি,১৯১৭) মধ্যপ্রদেশের মাহো গ্রামে। কিষনলাল ছোটোবেলায় পোলোর প্রতি আসক্ত ছিলেন। পোলো খেলোয়াড় হিসেবেই জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবেন বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু ১৪ বছর বয়সে সেই যে হাতে হকি তুলে নিলেন তারপর সারাজীবনেও আর নামাতে পারেননি।

মাত্র ষোলো বছর বয়সে কিষনলাল মাহো হর্সেস দলের প্রতিনিধিত্ব করেন। তারপর মাহো গ্রিন। পরে খেলতে শুরু করেন কল্যাণমল মিলের হয়ে। ১৯৩৭ সালে ভাগ্যের চাকা অনেকখানি ঘুরে গেল। তখনকার বিখ্যাত খেলোয়াড় এম এন জুতসি কিষনলালের খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ভাগওয়ান্ত ক্লাবে নিয়ে যান। সেবার টিকমগড়ের ভাগওয়ান্ত কাপে কিষনলাল অসাধারণ খেলেন। ১৯৪১ সালে কিষনলাল বি বি এবং সি আই রেলওয়েতে (অধুনা পশ্চিম রেলওয়ে) যোগ দেন। ১৯৪৮ সালে এই রেল দলই অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করার জন্য লন্ডন যাত্রা করে।

১৯৪৮ সাল ভারতের দিক থেকে নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। মাত্র তিন বছর আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে আর বহু আকাঙ্ক্ষার স্বাধীনতা এসেছে বছরখানেক (১৯৪৭) আগে। কিন্তু স্বাধীনতার সঙ্গে সহ্য করতে হয়েছে দেশভাগের যন্ত্রণা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমানদের অত্যাচারে দেশের অন্তরাত্মা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। এই অবস্থায় অলিম্পিকে খেলতে গিয়েছিল ভারতীয় হকিদল। খেলোয়াড়ি দক্ষতার চরম শিখরে পৌঁছনোর প্রতিজ্ঞা তো সকলের ছিলই, সেই সঙ্গে ছিল জাতি হিসেবে ভারতীয়ত্বকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস। কাজটা নেহাত সহজ ছিল না। দলে ছিলেন মুম্বইয়ের আটজন খেলোয়াড়। তাদের মধ্যে লেসলি ক্লডিয়াস এবং বলবীর সিংহের নাম অনেকেই জানেন। দলের নেতা কিষনলাল। অস্ট্রিয়া আর্জেন্টিনা স্পেন হল্যান্ড খড়কুটোর মতো উড়ে গেল। এরপর ফাইনাল। বিপক্ষ ইংলন্ড। দু'শো বছরের পরাধীনতার শোধ তুলল ভারতীয় দল। একদা দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাসক পর্যুদস্ত হলো চার গোলে। তার থেকেও বড়ো কথা, এই প্রথম আকাশের গায়ে ইউনিয়ন জ্যাক মাথা নীচু করে সরে দাঁড়াল। উদ্ধতভঙ্গিতে মাথা তুলল ভারতের পতাকা। জিতল হকিদল কিন্তু জয়ের মুকুট পরল সারা দেশ। এমনই এক দলের কোচের চরিত্রে অভিনয় করবেন অক্ষয়কুমার। আশা করা যায়, এই ছবিও মানুষের মন জয় করতে সক্ষম হবে। ■

পরিত্যক্ত হরিপ্রিয়ার পাশে কলকাতার রেস্তোরাঁ

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মনের মধ্যে জমে থাকা পাহাড়প্রমাণ অভিমান নিয়ে কতদূরেই বা যাওয়া যায়! বিশেষ করে সেই মন যেখানে জীবনের সব থেকে বড়ো সম্পদ-বিশ্বাস হারিয়ে একেবারেই নিঃস্ব। না, হরিপ্রিয়া কৈরাল পারেননি। এত বড়ো কলকাতা শহরে তিনি কাউকে চেনেন না। মহারাষ্ট্র থেকে এসেছিলেন কাকার হাত ধরে। শুনেছিলেন কলকাতা কাউকে ফেরায় না। যে যেমনই হোক, একটা হিল্লে এই শহরে ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু কপাল মন্দ। অনেক চেষ্টাচরিত্র করার পরও রোজগারের একটা সংস্থান হলো না। বেগতিক বুঝে ভাইঝির হাত ছাড়িয়ে পিঠটান দিলেন কাকা। সেই থেকে অবসাদ হরিপ্রিয়ার নিত্যসঙ্গী। সব মানুষকেই তার ভয়। মাঝে মাঝে কাজ খোঁজার জন্য বেরোতেন বটে, কিন্তু একদিন তাও পারলেন না। নিউ মার্কেটের কাছে একটা বেঞ্চে থম মেরে বসে পড়লেন।

হরিপ্রিয়ার গল্পে এরপর ঢুকে পড়ল পুলিশ। না, সাজানো নয়, সত্যিকারের পুলিশ। কলকাতা পুলিশের কয়েকজন অফিসার সেদিন নিউ মার্কেটের কাছে একটি বেঞ্চে হরিপ্রিয়াকে বসে থাকতে দেখেছিলেন। সন্দেহ হয়েছিল তাদের। জীবনের উদ্দেশ্য বিধেয় হারিয়ে ফেলা এরকম বহু মানুষকে তারা বসে থাকতে দেখেন। হরিপ্রিয়ার অসংলগ্ন কথাবার্তা থেকে তারা বুঝতে পারেন তিনি সুস্থ নন। প্রথমে তারা হরিপ্রিয়ার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তারপর গল্পটা একটু অন্যরকম। কলকাতার সুনামের সঙ্গে যথেষ্ট মানানসই।

কারণ হরিপ্রিয়া যা চেয়েছিলেন, পেয়েছেন। তিনি এখন ক্রাস্ট অ্যান্ড কোর কাফে নামের এক রেস্তোরাঁয় কর্মরত। রেস্তোরাঁটি চেতলার কাছে। হরিপ্রিয়া যখন হাসিমুখে খাবার পরিবেশন করেন তখন তাকে দেখে বোঝার উপায় থাকে না একদিন তিনি জীবন সম্পর্কে যাবতীয় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। সেই বিশ্বাস যে তিনি শুধু ফিরে পেয়েছেন তাই নয়, তার বিশ্বাসের ভিত এখন এতটাই মজবুত যে তিনি বলেন, 'আমি রান্না করতে ভালোবাসি। বেকিং নিয়ে পড়াশোনা করে আমি জীবনে আরও উন্নতি করতে চাই।'

কিন্তু কীভাবে ঘটল এই অভাবনীয় পরিবর্তন? জীবনের অন্ধকার থেকে যারা আলোয় ফিরেছেন তারা জানেন দিশা হারানো মানুষ যখন ফিরতে চায় তখন তার সর্বাগ্রে প্রয়োজন মানুষকেই। হরিপ্রিয়ার পাশেও দাঁড়িয়েছেন এমনই কয়েকজন মানুষ। ক্রাস্ট অ্যান্ড কোর রেস্তোরাঁর কথা আগেই বলা হয়েছে। এই রেস্তোরাঁটির বৈশিষ্ট্য, জীবনযন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে হতাশা এবং অবসাদে আক্রান্ত মেয়েদেরই এরা কাজ দেন। হরিপ্রিয়ার মতো এগারোজন মহিলা এখানে কর্মরত। চাকরি পাবার আগে এরা প্রত্যেকেই ডিপ্রেশন, অবসেশন, সিৎজোফ্রেনিয়ার মতো ভয়ঙ্কর অসুখে কষ্ট পেয়েছেন। এদের সকলের জীবনই হয়তো মনের গোলকধাঁধায় নিজেদের খুঁজতে খুঁজতে কেটে যেত, শেষ জীবনে হয়তো আশ্রয় মিলত কোনও অ্যাসাইলামে— যদি না ক্রাস্ট অ্যান্ড কোর কাফে রেস্তোরাঁর কর্তৃপক্ষ তাদের পাশে দাঁড়াতেন।

রেস্তোরাঁটি ঈশ্বর সঙ্কল্প নামের এক এনজিও-র অধীন। এনজিও-র সহ-সম্পাদক রিঙ্কু সোনি বলেন, 'ক্রাস্ট অ্যান্ড কোর ওদের জীবনের এক নতুন অধ্যায় রচনা করতে চায়। যাতে অতীত ভুলে ওরা সুন্দর এক ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। 'কেমন সেই ভবিষ্যৎ? জানা গেল, এখনও পর্যন্ত বাইশজন মানসিক অবসাদগ্রস্ত মহিলাকে কুকিংয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে রিঙ্কু বলেন, 'বেশিরভাগেরই কোনও আত্মবিশ্বাস ছিল না। শিখতে চাইত না। দশজন তো মাঝপথে ছেড়েই দিল।'

তাতে অবশ্য কোনও অসুবিধে হয়নি। এগারোজন প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়ে শুরু হলো রেস্তোরাঁর কাজ। পেস্ট্রি থেকে পাস্তা— রেস্তোরাঁয় সবই পাওয়া যায়। অনলাইনে অর্ডার দেবারও ব্যবস্থা আছে। দুপুর একটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত হৈ হৈ করে চলে রেস্তোরাঁটি। ঈশ্বর সঙ্কল্প এনজিও-র সম্পাদক এবং অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সর্বাণী দাস রায় বলেন, 'আমরা ওদের স্বাচ্ছন্দ্য অনুযায়ী কাজ করতে দিই। কাজটা যে ওদের ভালো লাগছে সেটাই সব থেকে বড়ো ব্যাপার।'

রেস্তোরাঁর কর্মীরা সকলেই খুশি। যে-যার মতো পছন্দের ক্ষেত্র তৈরি করে নিয়েছেন। সোনামণি চ্যাটার্জির কথাই ধরা যাক। নির্দ্বিধায় বলে দেন, 'রেস্তোরাঁর ডিউটি আমার ভালো লাগে না। আমি কিচেনেই খুশি।' কে বলবে সোনামণির একটা ভুল বিয়ে হয়েছিল। এবং তিনি হতাশার পাতালে তলিয়ে গিয়েছিলেন।

বিচারপতি চেলমেশ্বরের নিঃশব্দে প্রস্থান

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজনীতি ও দেশের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে খবরাখবর রাখা মানুষজন হয়তো ইতিমধ্যে শুনেছেন, মাস কয়েক আগে দেশের বিচার ব্যবস্থা নিয়ে প্রবল বিতর্ক সৃষ্টিকারী সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি জাস্তি চেলমেশ্বর অবসর নিয়েছেন। তাঁর বিদায়ের পর্বটি অনেকটাই নিঃশব্দে সমাধা হয়েছে। সাংবাদিক মহল জানাচ্ছেন তিনি সেই অর্থে কোনও ফেয়ারওয়েলই নেননি। তবে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বিগত ৫০ বছরে দেশের বিচার ব্যবস্থার ওপর যে কখনও কখনও হস্তক্ষেপের চেষ্টা হয়েছে সে কথা জানাতে ভোলেননি। তাঁর এই অনাড়ম্বর বিদায়ের মূলে কিন্তু রয়েছে তাঁর একান্তই ব্যক্তিগত অ্যাজেন্ডার মুখ থুবড়ে পড়া। দেশের বর্তমান প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রকে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার ২০১১ সালের ১০ অক্টোবর ওই পদে অভিষিক্ত করে। দেশের প্রধান বিচারপতির মতো সংবেদনশীল পদে বসানোর আগে সরকার প্রত্যাশিতভাবেই প্রার্থীর অতীত কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করে নেয়। চাকরির ক্ষেত্রে এটাই রীতি। এই সূত্রে ১২।১।১৮ তারিখে নিজের বাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে চেলমেশ্বর কংগ্রেসের রাজনীতি করার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক একটি অতি পুরনো মেডিক্যাল কলেজ ভর্তির ক্ষেত্রে দুর্নীতিতে প্রধান বিচরপতিকে জড়ানোর চেষ্টা করেন। মনে রাখা দরকার, ২০১১ সালে মিশ্রের নিযুক্তির সময় চেলমেশ্বরও একজন প্রবল দাবিদার হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। অল্পের জন্য তাঁর শিকে ছেঁড়েনি। কিন্তু তিনি যে সেই হতাশা কিছুতেই কাটাতে পারেননি তার প্রমাণ—তিনি শেষবেলায় মরণকামড় দেওয়ার অপচেষ্টা করলেন। বেছে নিলেন চিরাচরিত 'গণতন্ত্র বিপন্ন' হওয়ার কপট কৌশল।

দেশের মধ্যে প্রবল অস্থিরতা তৈরি করেও বিশ্বের চোখে ভারতের বিচার ব্যবস্থাকে খাটো করে দিতে তিনি দ্বিধা করেননি। ২০১১ সাল থেকে ২০১৪ সাল অবধি তাঁর বন্ধুভাবাপন্ন কংগ্রেস সরকার থাকায় তিনি অসন্তোষ নিয়ে টুঁ শব্দটি করেননি। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন কংগ্রেসের মার্গদর্শক শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী ও সভাপতি রাহুলের National herald-এর ফৌজদারি মামলায় জামিন নাকচ হতেই দল মরিয়া হয়ে ওঠে। কপিল সিব্বালের 'অযোধ্যা মামলার' রায় ২০১৯-এর ভোট পর্যন্ত স্থগিত রাখার অবৈধ দাবিও এর মধ্যে রয়েছে। পরিস্থিতি ঘুলিয়ে তুলতে চেলমেশ্বর তাঁর ব্যক্তিগত আক্রোশের নিবৃত্তির অস্ত্র খুঁজে পান। সাংবাদিক সম্মেলনে যাওয়ার আগে তিনি আরও তিন বিচারপতিকে প্ররোচিত করেন। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় সেদিন সকলের কাজকর্ম কিছুটা সামলে তিনি সর্বোচ্চ আদালতকে বেআব্রু করতে সেই বিস্ফোরক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার শুরু করেন। প্রধান বিচারপতি প্রবীণদের এড়িয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জাতীয় গুরুত্বের মামলাগুলি তুলনামূলকভাবে অনভিজ্ঞ বিচারপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছেন—এই অভিযোগ যে সম্পূর্ণ অমূলক তা বোঝা যায় যখন আদালত ঘোষণা করে যে এটি routine matter. কেননা কয়লা কেলেঙ্কারি মামলায় পূর্ব প্রধানমন্ত্রীকে অভিযুক্ত করা হলেও তা জুনিয়র বিচারকদের হেফাজতেই নেওয়া হয়েছিল।

এরপরই তিনি আর তাস গোপন করতে না পেরে রাজনৈতিকভাবে অকিঞ্চিৎকর কিন্তু জরুরি অবস্থায় ইন্দিরা গান্ধীর সহযোগী সি পি আই-এর ডি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বলেন দেশের বিচার ব্যবস্থা ঠিক পথে চলছে না। গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই। ঝাঁপিয়ে পড়ে

কংগ্রেসের উকিল বাহিনী। দেশের বিচার ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ীভাবে কলঙ্কিত করতে তাঁরা প্রধানমন্ত্রী হতে আকুল রাহুল গান্ধীর আগ্রহে ও চেলমেশ্বরের দেওয়া অজুহাতে প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে বিরল impeachment notice আনেন, যেটি ছিল জন্মসূত্রেই মৃত। চেলমেশ্বর ভেবেছিলেন এটি গৃহীত হলে মিশ্রকে সরিয়ে তাঁকে স্থলাভিষিক্ত করা হবে।

এর আগে প্রধান বিচারপতিকে অপদস্থ করতে পূর্বল্লেখিত মেডিক্যাল ভর্তির মামলার ভার তিনি নিজের এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে একটি পাঁচ বিচারকের মনোমতো বেঞ্চ গঠন করে তাঁদের হাতে সঁপে দেন। তাঁর চক্রান্তের আঁচ আগেই পেয়ে এ দায়িত্বের একমাত্র অধিকারী প্রধান বিচারপতি নতুন বেঞ্চ গঠন করে চেলমেশ্বরের তৈরি অবৈধ বেঞ্চ খারিজ করে দিয়েছিলেন। কেননা আইনি পরিভাষায় প্রধান বিচারপতি Master of the Roster। এমনই সব নজিরবিহীন কুকর্মের ইতিহাস গড়ে বিদায় নিয়েছেন জাস্তি চেলমেশ্বর। তিনি নাকি বিস্ফোরক বই লিখবেন বলে জানিয়েছেন। ভালো কথা, সেখানে দেশের সমগ্র বিচার ব্যবস্থাকে ধুলোয় লুটিয়ে নিজের অনৈতিক উচাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার অপচেষ্টার কথাও নিশ্চয় থাকবে। ▌

ফঃ ৬

বিপুল অনাদায়ী ঋণ
ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে বিরাট সমস্যা

তারক সাহা

১৯৬৯ সাল। বিভাজিত কংগ্রেস। কংগ্রেসের বাঘা বাঘা নেতারা কংগ্রেস ছেড়ে ছেন। দেশ সমাজতান্ত্রিকতায় বিভোর। এই রাজনৈতিক ডামাডোলে ইন্দিরা গান্ধীর এক চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত—ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ। এই মোক্ষম অস্ত্রে কুপোকাত সেই নেতারা যাঁরা ইন্দিরাকে ছেড়ে চলে এসেছেন। তারপর চলে গিয়েছে এতগুলি বছর। প্রশ্ন উঠছে ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে। ব্যাঙ্কিং সিস্টেমের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হল পুঞ্জীভূত 'নন পারফরমিং অ্যাসেট যার সরল বাংলা হলো অনাদায়ী ঋণ। এই অনাদায়ী ঋণ কতটা? সূত্র অনুসারে—৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ বা গত আর্থিক বছরের শেষ তিন চতুর্থাংশ কেবল রাষ্ট্রয়ত্ত ব্যাঙ্কেরই অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ হলো ৭.৩৪ লক্ষ কোটি টাকা। এর থেকে মুক্ত নয় বেসরকারি ব্যাঙ্কিং সংস্থাগুলিও। এই ব্যাঙ্কগুলির খাতায় রয়েছে ১.২০ লক্ষ কোটি টাকা। এই দুই অনাদায়ী ঋণের যে তথ্য সামনে আসছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির এই অনাদায়ী ঋণের ভার সমগ্র প্রদত্ত ঋণের ১২ শতাংশ, নিজস্ব ব্যাঙ্কগুলির এই ভার ৪ শতাংশ মোট প্রদত্ত ঋণের।

১৯৬৯ সালের ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সরকারি ব্যাঙ্কগুলি তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করবে দেশের আর্থিক উন্নতি ঘটাতে। তৎপরবর্তী যুগে প্রাইভেট ব্যাঙ্কগুলিতে টাকা রেখে অনেকেই সর্বস্বান্ত হয়েছে এবং অনেক ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে বহু আমানতকারীর অর্থের তছরূপ হয়েছে। কিন্তু পাঁচ দশক পেরিয়ে এসে ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণের ইতিবাচক দিক যাই থাক না কেন, এখন তার নেতিবাচক দিকগুলি বেশি করে প্রকট হচ্ছে। জাতীয়করণের পর কম আয়াসে মানুষ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি থেকে কম সুদে ব্যবসা চালাতে, শিক্ষা খাতে, কৃষি ক্ষেত্রে প্রচুর ঋণ পেয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের যে দুর্নীতি সামনে আসছে তাতে এই জাতীয়করণের সারবত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ইদানীংকালে মোদী সরকার ব্যাঙ্কগুলি সচল রাখতে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে দু'লক্ষ কোটি টাকা খয়রাতি মঞ্জুর করেছে। সরকারি ব্যাঙ্কগুলি যে লোকসানে চলছে, বিপুল পরিমাণ অনাদায়ী ঋণের ফলে সামগ্রিকভাবে যে ব্যাঙ্কিং সিস্টেম মুখ থুবড়ে পড়েছে, তার কারণ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে ব্যাঙ্কগুলির কর্মীদের অপদার্থতা, সীমাহীন দুর্নীতি, ব্যাঙ্কিং পরিচালনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের দৈনন্দিন চাপ, ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে শাখা অফিসগুলির ম্যানেজারদের সঙ্গে ঋণগ্রহীতার মধ্যে অসাধু যোগাযোগ ইত্যাদি। এইসব কারণগুলিই এই পর্বতপ্রমাণ অনাদায়ী ঋণের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ঋণ খেলাপের কারণগুলি দেখে ওয়াকিবহাল মহল থেকে দাবি উঠেছে, সরকার যখন ব্যাঙ্কিং পরিষেবা সরকারি স্তরে পরিচালনে ব্যর্থ তবে পুনরায় তা বেসরকারি পরিচালকদের হাতে তুলে দিক। কিন্তু তা হলেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? সরকারি ব্যাঙ্কগুলি যেমন অনাদায়ী ঋণ সমস্যায় জর্জরিত, তুলনায় কম হলেও বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলিও

সেই সমস্যা থেকে মুক্ত নয়।

অনুৎপাদক সম্পত্তি এবং অনাদায়ী ঋণের বোঝায় ভারাক্রান্ত দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বেসরকারি ব্যাঙ্ক আই সি আই সি আই, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কও। বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির সমস্যা অন্যরকম। বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি তাদের এজেন্টের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ঋণ বা পার্সোনাল লোন গ্রাহকদের মধ্যে বণ্টন করে। এই এজেন্টরা ব্যাঙ্ক থেকে ভালো কমিশনের লোভে নিরন্তর ফোন করে গ্রাহকদের কাছে। ঋণ গ্রহীতাদের তথ্য ভালো করে যাচাই না করেই এজেন্টদের সুপারিশের ওপর নির্ভর করেই ঋণ দিয়ে দেয় ব্যাঙ্কগুলি। দ্বিতীয়ত, এইসব ব্যাঙ্কগুলির সিইও-রা বিভিন্ন শিল্পসংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রুটিন মাফিক নিজেদের গরিমা প্রচারের আলোয় নিয়ে আসে আর তাঁদের সাফল্য দেখিয়ে নিজেদের বেতনসহ অন্যান্য সুযোগ হাতিয়ে নেয়। শুধু তাই নয়, এইসব ব্যাঙ্ক নিজেদের বার্ষিক আর্থিক ফলাফল ভালো দেখিয়ে শেয়ার বাজারে নিজস্ব সংস্থাগুলির শেয়ার মূল্য বাড়িয়ে নেয়।

অতি সম্প্রতি ২০১৭, ৩১ ডিসেম্বর শেষ হওয়া বছরে আই সি আই সি আই ব্যাঙ্ক ঘোষণা করেছে তাদের বর্তমান অ্যাসেট ভ্যালু ১০.৫ লক্ষ কোটি টাকা। কিন্তু প্রদীপের আলোর নীচেই যে গাঢ় আঁধার। ওই ব্যাঙ্কের শীর্ষ ব্যক্তিত্ব এবং সি ই ও ছন্দা কোচরের স্বামীর নাম ব্যাঙ্কের আর্থিক তছরূপের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। দীপক কোচরের বিরুদ্ধে বিমান বন্দরে লুক আউট নোটিশ জারি করা হয়েছে, যাতে নীরব মোদীর মতো নীরবে দেশে ছেড়ে যেতে না পারে। আর্থিক তছরূপের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে এরাজ্যের অন্যতম শিল্প গোষ্ঠী ভিডিওকনের কর্তা বেণুগোপাল ধুতের নামও। আই সি আই সি আইয়ের জালিয়াতি প্রকাশ্যে আসার পর প্রশ্ন উঠছে যে, রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের পক্ষে যারা সওয়াল করছেন তাদের কাছে প্রশ্ন যে, শুধু বেসরকারীকরণই এই ব্যাপক অর্থ তছরূপের জন্য যথেষ্ট নয়।

আর্থিক তছরূপের ক্ষেত্র কেবল আই সি আই সি আই-কে দোষ দিয়ে লাভ নেই। অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের পরিচালন কর্তৃপক্ষ ত্রুটিহীন নয়। ২০১৬ সাল ৮ সেপ্টেম্বর নোট বাতিলের কথা ঘোষণার পরই বেশ কয়েকটি অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক তাদের গ্রাহকদের নোট পালটে দেবার যে মোচ্ছব শুরু করে দেয়, অনেকেই এর মধ্যে কালা ধান্ধার গন্ধ পায়। প্রশ্ন হলো, ব্যাঙ্কের আরেক শীর্ষ মহিলা কর্তার সততা নিয়ে। ২০০৯ সালে নিযুক্তির পর আইআইএম আহমেদবাদ থেকে উত্তীর্ণ হওয়া শিখা শর্মা সি ই ও হবার পর তাকেই তিনবার সি ই ও বানায় অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক। চতুর্থ বার ব্যাঙ্ক তাঁকে সি ই ও নির্বাচনের পর তাদের এই সিদ্ধান্তে প্রতিবন্ধক লাগায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। অভিযোগ, তাঁর এই তৃতীয়বারেই ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণ ও নন্ পারফর্মিং অ্যাসেটের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় ২১,২৮০ কোটি টাকায় এবং ব্যাঙ্কের মোট মুনাফা অর্ধেক কমে হয় ৩,৬৭৯ কোটি টাকায়।

অনাদায়ী ঋণের সমস্যা কত গভীর এবং ব্যাপক তা নীচের সারণী থেকে স্পষ্ট হয় যায় (হিসেব কোটি টাকার অঙ্কে এবং জুন ৩০, ২০১৭ পর্যন্ত) ঃ—

ব্যাঙ্ক	অনাদায়ী ঋণ
স্টেট ব্যাঙ্ক	১৮৮,০৬৮
পঞ্জাব ব্যাঙ্ক	৫৭,৭২১
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া	৫১,০১৯
আই ডি বি আই	৫০,১৭৩
ব্যাঙ্ক অব বরোদা	৪৬,১৭৩
কানাড়া ব্যাঙ্ক	৩৭,৬৫৮
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক	৩৭,২৮৬
ইউকো ব্যাঙ্ক	২৫,০৫২
ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক	৩৫,৪৫৩
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক	৩১,৩৯৮

বেসরকারি ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক	অনাদায়ী ঋণ
আই সি আই সি আই	৪৩,১৪৮
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক	২২,১৩১
এইচ ডি এফ সি	৭,২৪৩
জে অ্যান্ড কে ব্যাঙ্ক	৫,৬৪১
ফেডারেল ব্যাঙ্ক	১,৮৬৮
কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক	৩,৭২৭

কোথায় গলদ?

ভিডিওকন কেলেঙ্কারি সামনে আসার পর থেকে প্রশ্ন উঠছে যে, ছন্দা কোচরকে কেন একা বলির পাঁঠা করা হচ্ছে? শীর্ষ পরিচালনা সংস্থায় আরও অধিকর্তা রয়েছেন—যেমন ভারতীয় জীবন বিমা সংস্থা যার প্রায় ১৩ শতাংশ অংশীদারিত্ব থাকায় এর চেয়ারম্যান ডি. কে. শর্মা ব্যাঙ্ক পর্ষদের অধিকর্তা। এছাড়া অন্যান্য অধিকর্তারা কী করছিলেন যখন ছন্দা কোচর ভিডিওকন সংস্থাকে এত বড় মাপের ঋণ মঞ্জুর করেন? তাঁরা কেন প্রশ্ন তুললেন না এই ঋণের যথার্থতা নিয়ে?

এধরনের ঘটনা কি এই প্রথম? মোটেই তা নয়। অতীতে যেমন ২০০৯ সালে তৎকালীন আই টি টাইকুন সত্যম্ কমপিউটারের রামলিঙ্গম্ রাজু তাঁর কোম্পানির মুনাফা ফুলিয়ে দেখিয়ে কোটি কোটি টাকা তছরূপের ঘটনা ঘটিয়েছিলেন এ নিয়ে এখনও ব্যাঙ্ক কর্তারা সতর্ক নন কেন? তা হলে কী এই বিপুল পরিমাণ আমজনতার সঞ্চিত অর্থ নিয়ে ব্যাঙ্ক কর্তারা যে অপাত্রে লুটিয়ে দিচ্ছেন তাতে অসাধু চক্রের যোগাসাজশ একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সর্ষের মধ্যেই যখন ভূত তখন সেই সর্ষে দিয়ে ভূত তাড়ালে কি সত্যিই ভূত তাড়ানো যায়?

দুধ আর মার্সিডিজের কর এক হতে পারে না : প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদাতা॥ সমস্ত পণ্য এবং পরিষেবার ক্ষেত্রে একই হারে কর চালু করার যে প্রস্তাব কংগ্রেস দিয়েছে, তা মানতে কার্যত অস্বীকার করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কংগ্রেসের দেওয়া এই প্রস্তাবের সমালোচনা করে মোদী বলেছেন, 'দুধ এবং মার্সিডিজ গাড়ি— দুটিরই এক কর কখনই হতে পারে না।' জি এস টি নিয়ে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস নেতা এবং প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম বারবারই দাবি তুলছেন, সমস্ত পণ্য ও পরিষেবার ক্ষেত্রে একই হারে কর চালু করা হোক। এমনকী, জি এস টি-কে 'গব্বর সিং ট্যাক্স' বলেও রাহুল গান্ধী ব্যঙ্গ করেছেন। জি এস টি চালুর বর্ষপূর্তির দিন কংগ্রেসের যাবতীয় সমালোচনার জবাব দিয়ে নরেন্দ্র মোদী এই ধরনের দাবিকে 'অবাস্তব ও হাস্যকর' আখ্যা দিয়ে বলেছেন, সব পণ্য ও পরিষেবার ক্ষেত্রে একই কর চালু করার কোনও ভাবনা কেন্দ্রীয় সরকারের নেই।

তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমার কংগ্রেসি বন্ধুরা যখন সব পণ্য ও পরিষেবার ক্ষেত্রে একই হারে কর চাপাতে বলেন, কার্যত তাঁরা তখন খাদ্যপণ্যেও ১৮ শতাংশ হারে কর চাপাতে বলেন। কারণ, কংগ্রেসের প্রস্তাব মানতে গেলে তো খাদ্যপণ্যের ওপর কর শূন্য রাখা যাবে না। এটা কী করে সম্ভব? তাহলে কি দুধ আর মার্সিডিজের ওপর একই হারে কর প্রযোজ্য হবে? এখন তো পণ্য ও পরিষেবা অনুযায়ী এই কর শূন্য থেকে ১৮ শতাংশের মধ্যে নির্ধারিত হয়।' স্বরাজ্য পত্রিকায় একটি সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী জি এস টি নিয়ে কথা বলতে গিয়েই এই মন্তব্য করেছেন।

জি এস টি চালুর ফলে গত এক বছরে ভারতের অর্থনীতি কতখানি লাভবান হয়েছে, এই সাক্ষাৎকারে তাও উদাহরণ দিয়ে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, 'জি এস টি চালু হওয়ার পর কার্যত সব

রাজ্যগুলির সীমান্তে চেকপোস্টের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে। এর ফলে আগে সীমান্তে কর দেওয়ার জন্য পণ্যবাহী গাড়িগুলির যে দীর্ঘ লাইন দেখা যেত, তা এখন প্রায় উধাও। এতে ট্রাক চালকদের সময় যেমন অনেকখানি বাঁচছে, তেমনই পণ্য পরিবহণে গতি আসছে। এছাড়া পরিবহণ সংস্থাগুলিরও কাজের গতি আনতে সুবিধা হচ্ছে। তাদের বাণিজ্যিক বৃদ্ধি ঘটছে। জি এস টি যদি জটিল হতো— তাহলে এসব সম্ভব হতো কি?

একটি প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জি এস টি-র মূল উদ্দেশ্য হলো তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে ইন্সপেক্টর রাজকে শেষ করা। এখন তো জমা থেকে ফেরত— সব কিছুই অনলাইনে হচ্ছে।' বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জি এস টি-কে এক বিরাট পরিবর্তন আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এর ফলে ১৮টি নানাবিধ কর এবং ২৩টি শুল্ককে একটি করের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে।'

বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দল যে জি এস টি-র সমালোচনা করছে, তার জবাব দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জি এস টি চালু করার সময় আমাদের একটিই লক্ষ্য ছিল। তা হলো কর কাঠামোকে আরও সহজ করে তোলা এবং এর ভিতর স্বচ্ছতা আনা। যে কোনও নতুন পদ্ধতি চালু করতে গেলে প্রাথমিকভাবে কিছু কিছু সমস্যা দেখা যায়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তবে, সেই সমস্যাগুলিকে তাড়াতাড়ি আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি এবং তার সমাধানও করতে পেরেছি।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাধারণ মানুষ, বিভিন্ন স্তরের ব্যবসায়ী এবং রাজ্য সরকারগুলির কাছ থেকে জি এস টি-র বিষয়ে আমরা মতামত নিয়েছি। তাদের মতামত বিশ্লেষণ করে জি এস টি-র ক্ষেত্রে কিছু কিছু সংশোধনও করা হয়েছে।' প্রধানমন্ত্রীর মতে, সহযোগিতাপূর্ণ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সব থেকে বড় নিদর্শন জি এস টি। তিনি বলেন, আগের সরকার পারেনি। কিন্তু আমরা পেরেছি সব রাজ্যগুলিকে সঙ্গে নিয়ে সর্বসম্মতভাবে কাজ করতে।'

জি এস টি-র সপক্ষে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী তথ্য সহকারে জানান, 'জি এস টি চালুর এক বছরের ভিতর ৪৮ লক্ষ নতুন সংস্থা পঞ্জীকরণ করেছে। ৩৫০ কোটি চালান এবং ১১ কোটি আয়কর দাখিলের ফর্ম জমা পড়েছে। অথচ স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত দেশে পঞ্জিকৃত সংস্থার সংখ্যা ছিল মাত্র ৬৬ লক্ষ। জি এস টি দেশের কতখানি উপকারে এসেছে— তা তো এই তথ্যের ভিতর দিয়েই প্রমাণিত।'

জি এস টির ফলে রাজ্যগুলি বেশি টাকা পাবে : জেটলি

নিজস্ব সংবাদদাতা॥ জি এস টি চালুর ফলে রাজ্যগুলি তাদের উন্নয়নখাতে আরও বেশি অর্থ খরচ করতে পারবে। জি এস টি চালুর বর্ষপূর্তিতে এই কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। অর্থমন্ত্রী বলেন, ক্ষতিপূরণ শুল্কের সুবিধা-সহ এখন রাজ্যগুলি ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষের তুলনায় ১৪ শতাংশ কর বাবদ আয় বৃদ্ধির সুবিধা পেয়েছে। কিন্তু আই জি এস টি যখন ধাপে ধাপে ছাড় দেওয়া হবে, তখন ক্ষতিপূরণ শুল্ক বাদ দিয়েই রাজ্যগুলির করবাবদ আয় ১৪ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে। এর ফলে বিশেষ লাভবান হবে পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলি। এই বর্ধিত আয় রাজ্যগুলি তাদের উন্নয়ন খাতে খরচ করতে পারবে।'

জি এস টি-র বর্ষপূর্তিতে একটি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, প্রত্যক্ষ করের ওপর জি এস টি-র প্রভাব এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। এখন আরও অনেক বেশি মানুষ তাদের ব্যবসায়িক টার্নওভার জানাতে এবং সেই মতো কর জমা দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

অর্থমন্ত্রী দাবি করেন, জি এস টি-র মাধ্যমে কর আদায়ের প্রক্রিয়াটি আরও যতই উন্নত এবং কার্যকরী হবে, ততই ২৮ শতাংশ করের ধাপ থেকে বেশ কিছু পণ্য নেমে আসবে। শুধুমাত্র বিলাস সামগ্রীই ওই ২৮ শতাংশ করের আওতায় থাকবে। এছাড়াও কর আদায় যতই বাড়বে, ততই বেশ কিছু পণ্যকে একত্রিত করে একটিই ধাপে নিয়ে আসার সম্ভাবনাও বাড়বে। তবে, আগে দেখা হবে নতুন কর কাঠামোয় কতটা উন্নতি হচ্ছে।

কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর সব পণ্য এবং পরিষেবাতে একই হারে করের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'এটা একটা ভুল ধারণা। একই হারে সেইসব দেশেই সম্ভব যেখানে দেশের সবশ্রেণীর নাগরিকই মোটামুটি উচ্চ আয়ের এবং সকলেরই এক হারে কর দেওয়ার ক্ষমতা আছে। রাহুল গান্ধী হয়তো সিঙ্গাপুরকে দেখে এসব কথা বলছেন। কিন্তু সিঙ্গাপুর আর ভারত তো এক নয়।

জেটলি বলেন, 'সিঙ্গাপুর বিলাস দ্রব্য এবং খাদ্য পণ্যে একই সঙ্গে ৭ শতাংশ হারে জি এস টি চালু করতে পারে। কিন্তু সিঙ্গাপুরের এই মডেল ভারতে চালু করা কি সম্ভব? মনে রাখতে হবে, ভারতে এখনও এক বড় অংশের মানুষ কম আয়ের। এই কম আয়ের মানুষদের জন্য কর কাঠামোয় কিছু তো ছাড়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে। কাজেই অধিকাংশ খাদ্যপণ্য, কৃষিপণ্য এবং কৃষিজাত সামগ্রী ও সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য পণ্যসামগ্রীর ওপর করের হার কম রাখতেই হবে। এদের ছাড় দিয়ে উচ্চ আয়ের মানুষদের ওপর কর বাড়াতেই হবে।'

জি এস টি-র সুফল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, দেশের কর ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ এবং সরল করে তুলতে জি এস টি একটি সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ। গত বছর জুলাই মাস থেকে দেশের সবরকম জটিল কর কাঠামো তুলে দেওয়া হয়েছে। সেই সময় দেশে ১৩টি মাল্টিপল কর এবং ৫টি মাল্টিপল রিটার্ন ব্যবস্থা চালু ছিল। প্রতিটি রাজ্যের জন্য আলাদা আলাদা কর কাঠামো ছিল। সেই অনুযায়ী রিটার্ন জমা দিতে হত। এই রকম একটি জটিল ব্যবস্থা অবসানের কথা চিন্তা করেই জি এস টি চালু করা হয়েছে।'

দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে জেটলি বলেন, 'জি এস টি কাউন্সিলের মাধ্যমে সব কটি রাজ্য তাদের প্রস্তাব দিতে পারবে, মতামত জানাতে পারবে এবং নতুন কর ব্যবস্থায় অংশ নিতে পারবে। এতে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই আরও দৃঢ় হবে।

ভারত অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা মুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতকে অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (এইচ-৫ এন- ৮ এবং এইচ-৫ এন-১) মুক্ত দেশ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সম্প্রতি কর্ণাটকের দাশরাহাল্লি, ওড়িশার সান্ধাকুন্দা ও বারাপাড়িয়া পারাদীপের বিভিন্ন জায়গায় অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার মহামারি দেখা গিয়েছিল। এই প্রেক্ষিতে, ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ ও মহামারি রুখতে যে কর্মপরিকল্পনা রয়েছে, সে অনুযায়ী অভিযান চালানো হয়। অভিযানের অঙ্গ হিসেবে রোগাক্রান্ত এলাকার এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধে সমস্ত পোলট্রি মুরগি, ডিম, খাবার ও অন্যান্য সংক্রামিত সামগ্রী নির্মূল করা হয়েছে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পোলট্রি ও পোলট্রিজাত পণ্য বহন প্রক্রিয়ার ওপর নজরদারি চালানো হয়। মহামারি ছড়িয়ে পড়া এলাকাগুলিতে জীবাণু ধ্বংসের অভিযান চালানো হয়।

অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রেক্ষিতে কর্ণাটক ও ওড়িশার পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্যেও নজরদারি চালানো হয়। নজরদারি শেষে কোথাও এই ইনফ্লুয়েঞ্জার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এসব সত্ত্বেও রাজ্যগুলিকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে, বিশেষ করে পরিযায়ী পাখির আনাগোনা হয় এমন জায়গায় সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় পশুপালন, ডেয়ারি ও মৎসচাষ দপ্তরের পক্ষ থেকে এই তথ্য দেওয়া হয়েছে।

সন্ন্যাসিনীকে ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত বিশপ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জলন্ধরের রোমান ক্যাথলিক ডায়োসেসের বিশপ ফ্রাঙ্কো মুরাক্কাল সম্প্রতি এক সন্ন্যাসিনীকে ধর্ষণ ও তাঁর ওপর বিকৃত যৌনাচার চালানোর অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন। ওই সন্ন্যাসিনী কেরলের কোট্টায়াম জেলার কুরাভিলাঙ্গাদ থানায় এই মর্মে অভিযোগ জানান। পুলিশ সি আর পি সি ১৬৪ নং ধারায় সংশ্লিষ্ট সন্ন্যাসিনীর অভিযোগ আইনসিদ্ধভাবে নথিভুক্ত করতে জেলার ভারপ্রাপ্ত জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আবেদনটি পর্যালোচনা করবে। ইতিমধ্যে অভিযোগকারিণীর ডাক্তারি পরীক্ষা করানো হচ্ছে।

ডি এস পি কে. সুভাসের বয়ান অনুযায়ী বিগত ২০১৪ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে কুরাভিলাঙ্গাদ অঞ্চলের একটি কন্‌ভেন্টের ভেতরে অভিযোগকারিণীকে নিয়মিত ধর্ষণ করা হতো বলে অভিযোগ। অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ায় সন্ন্যাসিনী জানান এই মুহূর্তে তিনি আর বিশদে কিছু বলার অবস্থায় নেই। তিনি

ফ্রাঙ্কো মুরাক্কাল

মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত, যা বলার তিনি সঠিক সময়েই বলবেন।

অভিযোগকারিণীর বাড়ি কেরলের আঙ্গামাল অঞ্চলে। তিনি মিশনারিজ অব যেশাস-এর সঙ্গে যুক্ত যে সংস্থা পক্ষান্তরে জলন্ধর ডায়োসেসের আওতার মধ্যে। পুলিশ সূত্র অনুযায়ী বিশপই নাকি তাদের কাছে প্রথম সন্ন্যাসিনীর বিরুদ্ধে তাঁকে ভয় দেখানোর বিষয়ে অভিযোগ করেন। অভিযোগকারিণীকে অন্য জায়গায় বদলি করার কারণে তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন।

পরবর্তী সময়ে পুলিশ সন্ন্যাসিনীর অভিযোগ গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তকারীদের দীর্ঘ ৬ ঘণ্টার জেরা চলাকালীন অভিযোগকারিণী জানিয়েছেন, তাঁর ওপর এই অন্যায়ের প্রতিকার চেয়ে তিনি যথোপযুক্ত জায়গায় বারবার অভিযোগ জানিয়েছেন। চার্চের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণাধিকারী কার্ডিন্যাল জর্জ অ্যালেনচেরি যখন কুরাভিলাঙ্গাদে চার্চ দর্শনে এসেছিলেন তখন ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি এই ঘৃণ্য ঘটনার প্রতিকার চেয়ে অভিযোগ জানালে তাঁকে লিখিত অভিযোগ করতে বলা হয়। তিনি তাঁর অন্য আত্মীয় স্বজনকে সঙ্গে নিয়ে কার্ডিনালের কথামতো অভিযোগপত্র জমা দেন। ক্যাথলিক চার্চের অন্দরে ঘটে যাওয়া দুষ্কর্মের ছবি প্রকাশ্যে এসে পড়ায় কোট্টায়াম জেলায় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

আখ চাষিদের রোজগার বাড়াতে কেন্দ্রের নতুন উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন দিল্লির লোক-কল্যাণ মার্গে ১৪০ জন আখ চাষির সঙ্গে তাদের সুবিধে অসুবিধের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করেন। এই চাষিরা উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের বিভিন্ন জায়গা থেকে নতুন দিল্লিতে আসেন। মন্ত্রীসভার আগামী বৈঠকে চলতি খরিফ মরশুমের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য উৎপাদন ব্যয়ের ১৫০ শতাংশ ধার্য করায় অনুমোদন দেওয়া হতে পারে বলে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন। এর ফলে চাষিদের আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। তিনি এও জানান যে আগামী দু' সপ্তাহের মধ্যে এই বছরের (২০১৮-১৯) আখের মরশুমের জন্য আখের যথাযথ ও লাভজনক মূল্য ঘোষণা করা হবে। এই বছরের মূল্য গত অর্থবর্ষের তুলনায় বেশি হবে বলে শ্রী মোদী জানান। আখ থেকে উপার্জিত অর্থ ব্যয়ের চেয়ে ৯.৫ শতাংশ বেশি হলে চাষিদের উৎসাহভাতাও দেওয়া হবে।

আখ চাষিদের বকেয়া মেটাতে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির বিষয়েও প্রধানমন্ত্রী চাষিদের জানান। নয়া নীতি প্রণয়নের ফলে গত সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে ৪০০০ কোটি টাকারও বেশি বকেয়া অর্থ চাষিদের দেওয়া হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। শ্রী মোদী চাষিদের আশ্বস্ত করে বলেন যে, আখ চাষের বকেয়া মেটাতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে রাজ্য সরকারগুলিকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী চাষিদের স্প্রিং কলার ও ড্রিপ সেচের মতো আধুনিক চাষের পদ্ধতি অবলম্বন এবং সোলার প্যানেল বসানোরও উপদেশ দেন। ফসলের গুণমান বাড়ানোর ওপরও তিনি জোর দেন। ফসল ফলনের পরে পড়ে থাকা বর্জ্যের যথাযথ ব্যবহার করে তা থেকে সার ও পরিপোষক তৈরির মাধ্যমে বাড়তি রোজগারের উৎস হিসেবে ব্যবহারের আহ্বান জানান। ২০২২-এর মধ্যে রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমাণ ১০ শতাংশ পর্যন্ত কমানোর পরামর্শ দেন শ্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রী কর্পোরেট সংস্থাগুলির সঙ্গে তাঁর সাম্প্রতিক আলাপচারিতার বিষয়ে চাষিদের জানান। চাষিদের রোজগার বাড়াতে ফসলের গুণমান, বৃদ্ধি, ওয়েরহাউস ও গুদামের ব্যবস্থাপনা, উচ্চমানের বীজের ও বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে আরাও বেশি করে বিনিয়োগের জন্য তিনি আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী আরও স্মরণ করিয়ে দেন যে আখ চাষিদের ২১ হাজার কোটি টাকারও বেশি আর্থিক বোঝা লাঘব করতে ইতিপূর্বে ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬-তেও কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপ করেছে। চিনিকলগুলির মাধ্যমে চাষিদের এই অর্থ প্রদানের বিষয়টি সুনিশ্চিত করা হয়েছিল।

পুস্তক প্রসঙ্গ

জাতীয়তাবাদী শিক্ষক আন্দোলনের এক আকর গ্রন্থ

গোপাল চক্রবর্তী

সর্বভারতীয় শিক্ষক আন্দোলনের পুরোধা, প্রাণপুরুষ সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষাব্রতী মুকুন্দ কুলকার্ণীজীর ৭৫ তম জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত তথ্যসমৃদ্ধ স্মারক গ্রন্থ 'শ্রী মুকুন্দ কুলকার্ণী স্মরণে' শিক্ষক আন্দোলনের মাইল ফলক হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই গ্রন্থে লেখক যেমন বহু অজ্ঞাত এবং তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যের সংযোজন করেছেন তেমনি বহু খ্যাতনামা, বিদগ্ধ, জাতীয়তাবাদী চিন্তাশীল শিক্ষাবিদের লেখা ও ভাষণের অংশ বিশেষ সংকলিত করে গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. মুরলীমনোহর যোশী, জেনারেল (অব:) শঙ্কর রায়চৌধুরী, প্রফেসর কে. নরহরি, ড. তরুণ মজুমদার, প্রফেসর তথাগত রায়, স্বামী মৃগানন্দ প্রমুখ।

বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষক এবং শিক্ষা সচেতন মানুষের কাছে গ্রন্থটি এক অমূল্য সম্পদ। এই গ্রন্থে পাঠক শ্রদ্ধেয় কুলকার্ণীজীর ব্যক্তিগত জীবন ও আদর্শের সঙ্গে যেমন পরিচিত হতে পারেন, তেমনি পরিচিতির সুযোগ ঘটে শিক্ষক আন্দোলন নিয়ে তাঁর সুচিন্তিত চিন্তাধারার সঙ্গে। কমিউনিস্ট প্রভাবিত শিক্ষক আন্দোলনের অসারতা কুলকার্ণীজী সম্যক ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন 'ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডল।' কুলকার্ণীজী দেখলেন কমিউনিস্ট পরিচালিত 'শিক্ষক সংগঠন' এবং 'ট্রেড ইউনিয়ন'-এর মধ্যে কোনও তফাত নেই। এই সংগঠনের একমাত্র উদ্দেশ্য সরকারকে চাপ দিয়ে শিক্ষকদের দাবিদাওয়া আদায় করা। শিক্ষা, শিক্ষক, দেশ, সমাজের সম্পর্কে কোনও চিন্তা এই গোষ্ঠীর নেই। কুলকার্ণীজী ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই ভাবধারা সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছিলেন যে, 'শুধু

শিক্ষকদের দাবি আদায় নয়, শিক্ষার সমস্যা নিয়েও কাজ করতে হবে।'

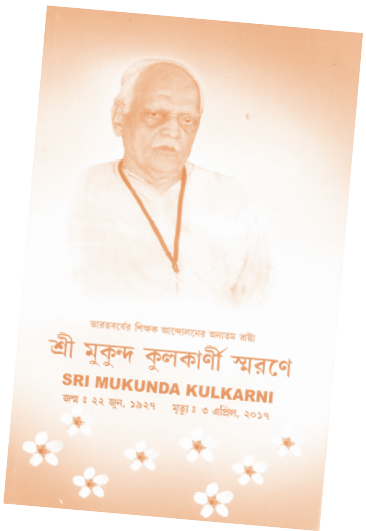

কুলকার্ণীজী প্রতিষ্ঠিত 'অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ' একটি পেশাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হলেও ভারতের অন্য শিক্ষক সংগঠনগুলির সঙ্গে এর আদর্শগত পার্থক্য রয়েছে। অন্যান্য শিক্ষক সংগঠনগুলি কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলের শাখারূপে কাজ করে। সব রাজনৈতিক দল ধরেই নেয় যে শিক্ষকদের দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের বিষয়ে কোনও পাকাপোক্ত ধারণাই নেই। কাজেই তাদের কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলের অভিভাবকত্বে থাকতেই হবে। সমস্যার কথাটিও স্পষ্ট ভাবে গ্রন্থে উল্লেখ আছে— "এই সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি এবং তাদের মতাদর্শ ও নীতি প্রায়ই ভারতবিরোধী। দেশের মধ্যে আঞ্চলিকতা, ভাষা, শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে এরা দেশের মানুষের মধ্যে বিভেদ উৎপন্ন করে ক্ষমতা দখল করতে চায়। সেই সঙ্গে সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় ঘটিয়ে থাকে।"

'শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ' শিক্ষকদের সম্বন্ধে রাজনৈতিক দলগুলির এই মূল্যায়নকে অবমাননাকর বলে মনে করে। ভারতবর্ষে সর্বদা 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে' এই আদর্শ বজায় ছিল ও রয়েছে। শিক্ষক সমাজ রাজনৈতিক দলের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবে তাদের কোনও স্বাধীন চিন্তা ও মতামত থাকবে না, এই নীতিতে মহাসঙ্ঘ বিশ্বাস করে না।

এই গ্রন্থে প্রাসঙ্গিক ভাবে এবং পর্যায়ক্রমে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি বিদ্বেষী তথাকথিত সেকুলার এবং প্রতিক্রিয়াশীল কমিউনিস্টদের চরিত্র যথাযথ ভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছেন লেখক। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী শিক্ষক আন্দোলনের ইতিহাসে গ্রন্থটি এক আকরগ্রন্থ হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। গ্রন্থটি সার্বিক উৎকর্ষতার মধ্যেও কিছু কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ দৃষ্টিকটু হয়েছে।

পুস্তক : শ্রী মুকুন্দ কুলকার্ণী স্মরণে। প্রকাশক : অজিত কুমার বিশ্বাস। মূল্য : ৬০ টাকা মাত্র।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

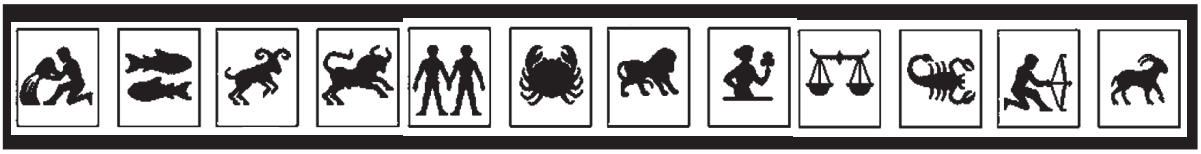

৯ জুলাই (সোমবার) থেকে ১৫ জুলাই (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রবি, কর্কটে বুধ-রাহু। সিংহে শুক্র তুলায় বক্রী বৃহস্পতি, ধনুতে বক্রী শনি, মকরে বক্রী মঙ্গল-কেতু। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র মেষে ভরণী থেকে কর্কটে অশ্লেষা নক্ষত্রে।

মেষ : কৃষ্টি-সংস্কৃতি-শাস্ত্রানুশীলন ও দর্শনে প্রভূত জ্ঞান অর্জন। উচ্চশিক্ষা বা কর্মোপলক্ষ্যে সন্তানের দূরদেশ গমন, ললিত-কলায় অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ। পতি-পত্নীর শারীরিক অসুস্থতা পবিত্র মানসিকতা কলুষিত করবে।

বৃষ : মনোরম কর্মের পরিবেশ, উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি। প্রবাসী আত্মীয় অথবা সুধীজনের শুভ সংবাদ যা গর্ব ও মর্যাদার। সপ্তাহের শেষ ভাগে উপার্জন বৃদ্ধিতে বিধি-বহির্ভূত পথের হাতছানি। জ্ঞাতি শত্রুতা ও প্রণয়ে আকস্মিক দুর্যোগের ঘনঘটা।

মিথুন : গৃহ ও আর্থিক শ্রীবৃদ্ধিতে লাইফ পার্টনারের সদর্থক ভূমিকা। গুরুজন ও দেব-দ্বিজে ভক্তি শ্রদ্ধা। সেবামূলক ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে সখ্য বৃদ্ধি ও সাধুবাদ প্রাপ্তি। সন্তানের চঞ্চল মনোভাব উদ্বেগের বিষয়।

কর্কট : এ সপ্তাহে ব্যবসায় বিনিয়োগে ভালো ফল আশা করতে পারেন। পারিবারিক পরিবেশ ও স্বজন সম্পর্ক সুখকর নয়। প্রিয়জনের স্বাস্থ্যাবনতি। কর্মস্থানে অধস্তনের সহায়তা ও দক্ষতা বৃদ্ধি।

সিংহ : বিদ্যার্থী, গবেষক, শিক্ষক, সাংবাদিকের সৃষ্টির আনন্দ ও স্বীকৃতি। সম্পত্তি সংস্কার বিষয়ে ভ্রাতৃবিরোধ। ভ্রাতা, ভগ্নী, প্রতিবেশীর সঙ্গে উত্তেজক কথাবার্তা কৌশলে পরিহার করুন। দীর্ঘ দিনের কোনও বাসনা পূরণের সম্ভাবনা।

কন্যা : সহানুভূতি, সমবেদনা, দয়ার্দ্র হৃদয়ে সৃষ্টিশীলতা ও মানবিক গুণের বিকাশ। গুরুজনে ভক্তি-শ্রদ্ধা, আত্মীয় সমাদর। জ্ঞানান্বেষণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বহুমুখী প্রয়াস ও অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ, অন্ত্যজ শ্রেণীর সহায়তা। লাইফ পার্টনারের কর্মপ্রাপ্তির সংবাদ হর্ষোৎফুল্লের কারণ।

তুলা : বেকারদের কর্মসংস্থান, পুত্রের উচ্চশিক্ষা ও প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষার জন্য শুভ সপ্তাহ। পিতৃদত্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও নিজ শরীর বিষয়ে বিড়ম্বনা ও মানসিক উদ্বেগ। আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা কঠিন, কুহকিনীর ছল-চাতুরিতে প্রতারণা ও সম্মানহানি।

বৃশ্চিক : জ্ঞান ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ। সমাজ প্রগতিমূলক কাজ। দেব-দ্বিজে ভক্তি ও সাত্ত্বিক চেতনার উন্মেষ। একাধিক উপায়ে আয়ের পথ প্রশস্ত। সুন্দর পোশাক, সুখাদ্য, বিলাস ও অভিজাত্য গৌরব। সপ্তাহের প্রান্তভাগে সন্তানের সুকৃতি। শিল্প ও সৌন্দর্যায়নে লাইফ পার্টনারের কাঙ্ক্ষিত ফল প্রাপ্তি।

ধনু : শরীর, মন, বুদ্ধি দ্বারা নানাবিধ জ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টায় ব্যপৃত থাকবেন। নিজ দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তায় কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা। গৃহ ও মাতৃসুখ। বিজ্ঞানী, গবেষক, ডাক্তার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের কর্মকুশলতা বৃদ্ধি ও অর্থাগমের বিকল্প পথের সন্ধান।

মকর : পারিবারিক দায়িত্ব পালনে ব্যয়বাহুল্য ও কর্মক্ষেত্রে অস্বস্তিকর পরিবেশ। চর্ম, খনিজ ব্যবসা এবং পুলিশ, আর্মি, বি.এস.এফের দক্ষতার স্বীকৃতি ও মান্যতা। শিল্পী ও সুন্দরের পূজারিদের প্রতিভার বহুমুখী প্রয়াস ও সৌভাগের নতুন দিশা। প্রতিবেশীর সঙ্গে সখ্য বৃদ্ধি। যুবক বন্ধু হিতকারী।

কুম্ভ : উচ্চশিক্ষা, গবেষণা তত্ত্ব ও তথ্যসন্ধানী দৃষ্টির সফল প্রয়াস। স্বীয় বাকপটুতা ও বুদ্ধিমত্তায় সামাজিক ও প্রতিষ্ঠায় স্বীকৃতি। গৃহ, জমি, ফ্ল্যাট ক্রয়ের সফল উদ্যোগ। বিদেশ যাত্রায় সদর্থক ফল। স্নায়ু ও শিরঃপীড়ায় ক্লেশ।

মীন : সততা-চিন্তার স্বচ্ছতা ও শাস্ত্রীয় জ্ঞান অর্জনে সফল মনস্কাম। প্রতিষ্ঠানের প্রধান গুণীজন সাত্ত্বিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গলাভ ও মানসিক প্রশান্তি। মাতুল স্থানীয়ের শরীরের যত্নের প্রয়োজন। সন্তানের মেজাজি মনোভাবে ব্যথিত হবেন।

• *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

—শ্রী আচার্য্য